

যৌথ। এঁটে যাই। -হু.

যদি এটা পেয়ে যাও, ভাঁজ করে ফিরিয়ে দিয়ো।

শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায় যা শুধু গল্পে ঘটে: সত্যিকারের ড্রাগন নেই, আর পার্সেল উড়ে ফিরে আসে না। সত্যিকারের স্থানান্তরের জন্য শেষ পাতাটা দেখো। -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি · ৬

একটা জায়গা তিনজনের

LinguAula

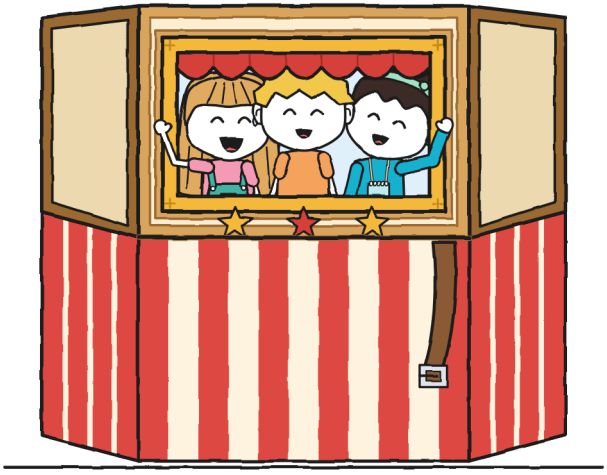

(গুনির খাতা)

সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

অসম্ভব ডেলিভারি · ৬
একটা জায়গা তিনজনের

সিরিজের ষষ্ঠ বই। আগের বইগুলো: “এই পার্সেলটা কামড়ায়”, “মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না”, “ফেরত, দয়া করে”, “এখানে নয়, টুকরো!” আর “একটা কেক দুজনের”।

লেখা ও ছবি: LinguAula

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

ফন্ট: Andika, Patrick Hand, Caveat, Courier Prime, Atma, Galada ও Hind Siliguri (SIL OFL লাইসেন্স)।

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এটা তিনজনে বয়। আমি হাতল বেছে নিয়েছি। -হু.

কে কে

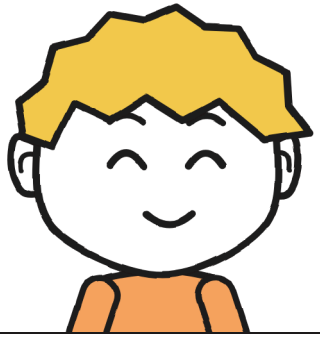

গুনি। মাপে সেন্টিমিটারে। এই সপ্তাহে আরেকটা জিনিসও গোনে।

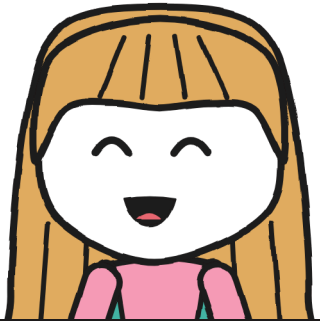

তুলিতা। পথ চেনে। বুঝিয়ে বলাটা অন্য ব্যাপার।



নোয়া। তুলিতার অনেক আগের বন্ধু। মাপে পা ফেলে: পা তো সবসময় সঙ্গেই থাকে।

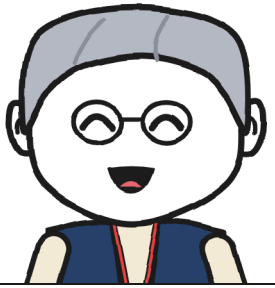

ইরেনে। থিয়েটার ওয়ার্কশপ চালান। কোন দিকে বলেন না: বলেন "থামো"।

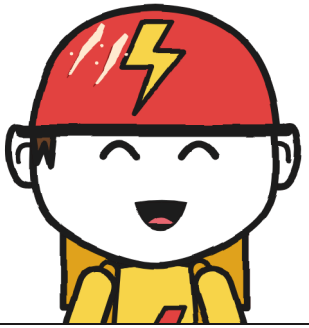

তোনিও। বিজলির আর দোকানের। সময় ধরে, মতামত দেয় না। প্রায়।



মারা। পার্সেল ধার দেন। বাক্স্র্টা ছাড়েন না।

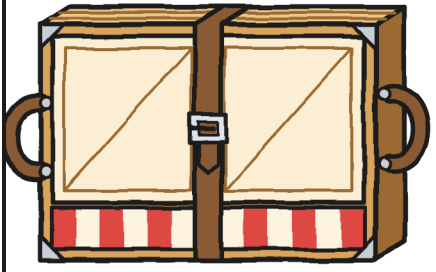

৬ নম্বর। একটা থিয়েটার, যা একটা বাক্সে এঁটে যায়। বেল্টটা কেউ না ধরলে যেদিকে খুশি খুলে যায়।



র.

র. প্রেরক। এবার একটা ইনভেন্টরিতে একটা লাইন রেখে গেছেন।



অধ্যায় ১

তিনজন কেন লাগে?

৫ নম্বর খাতাটা শেষ হয়েছে একটা ডায়ালে দুটো কাঁটা দিয়ে, আর আমি ওটা তেমনিই বন্ধ করেছি, কাউকে কাঁটা সরাতে না বলে। শেষ-হওয়া খাতা যেমন রাখো, তেমনই থাকে। এটাই ওদের ভালো দিক: তা নিয়ে আর কেউ তর্ক করতে পারে না।

৬ নম্বরটা কমলা। মান্দারিন-কমলা, তাড়া না থাকলে যেটা এক টানে ছাড়ানো যায়, আর এক কোণে দোকানের সিলমোহরও আছে। মারা ওটা কাউন্টারে গোলাপিটার পাশে রেখে পেছনের ঘরে চলে গেলেন, এমনিতেই সাজানো কয়েকটা বাক্স সাজাতে। মারা খাতা হাতে দেন না: যেদিকে তাকাবে, সেখানে রেখে যান।

প্রথম পাতার জন্য আমার একটা নিয়ম আছে। ২ নম্বরে লিখেছিলাম অফিশিয়াল, ৩ নম্বরে গোপন, ৪ নম্বরে চূড়ান্ত, ৫ নম্বরে শান্ত। তালাওয়ালা চারটে শব্দ, আর চারটেই হুলিতা পড়েছে সবার আগে, আমারও আগে। এবার আমি এমন একটা শব্দ খুঁজলাম, যেটা ব্যাপারটা আগে থেকেই ধরে নেয়।

ওপরে লিখলাম ডেলিভারির খাতা ৬ · গুনির, যেটা লেখারই কথা। তার নিচে, একটাই শব্দ:

যৌথ।

আর অর্ধেক পাতা ফাঁকা রাখলাম, যদি দরকার পড়ে। কীসের দরকার, জানতাম না। একটু পরেই জানলাম: ফাঁকা থাকল না, এক মিনিটও না।

হুলিতা কাউন্টারের ওপাশে ছিল। ও খাতাটা চাইল না; এক আঙুলে টেনে নিল, সবুজ মার্কারের ঢাকনা খুলল, আর অর্ধেক পাতায় এত বড় অক্ষরে লিখল যে তা মার্জিনে পৌঁছে গেল, একটু ভাবল, তারপর মার্জিন ধরেই চলল। তারপর "আমি করিনি" মুখ করে মার্কারের ঢাকনা আটকাল, ওই দোকানে যে মুখটা এখন সবারই।

আমি প্রথম পাতাটা যৌথ করেছি, আমার হাতের লেখা দিয়ে। -হু.

কতটা জায়গা নিয়েছে, মেপে দেখলাম: নিচের অর্ধেকটা, পুরোটা। আমার শব্দটা, চারপাশে যত ফাঁকা রেখেছিলাম তাসহ, ওপরের অর্ধেকটা নিয়েছে। দুই অর্ধেক। ভাগটা আমার বেশ যুক্তিসংগত মনে হলো।



যে আগের খাতাগুলো না পড়েই এই খাতায় এসেছে, তার জন্য, যথারীতি: দোকানটার নাম অসম্ভব ডেলিভারি, মালকিন মারা, যিনি জাদুকরী, মাথায় বেগুনি টুপি, আর যাঁর একটা সিলমোহর আছে, ছাপ দিলেই নেভানো মোমবাতির গন্ধওয়ালা ফুলকি ছিটকে ওঠে। বাঁ দিকের তাকে উনি ফেরত পার্সেল রাখেন, যেগুলো কেউ পৌঁছে দিতে পারেনি, সবগুলো পাঠিয়েছেন র.। যে নেয়, সে যদি লেবেলে মোছে না এমন কালিতে সই না করে, ভোর হলে পার্সেলটা উড়ে নিজের তাকে ফিরে আসে। ছিল কুড়িটা। হুলিতা আর আমি পাঁচটা পৌঁছে দিয়েছি: একটা ড্রাগনের ডিম, পায়ওয়ালা কিছু বীজ, একটা ঘণ্টি, একটা পৌঁছানোর যন্ত্র আর এলিয়ার রুটির দোকানের জন্য একটা স্ট্যান্ড। দেয়ালে, সবুজ অক্ষরে, লেখা বাকি ১৫। বিজলির তোনিওর জায়গা একটা উপুড় করা বাক্সে, টুলগুলোর পাশে। আপাতত।

সোমবার, এলিয়ার চিঠির পরদিন, আমি স্কুল থেকে বেরিয়ে সোজা দোকানে গেলাম। হুলিতা কাউন্টারে হাতে একটা খাম নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ওটা সবুজ ছিল না, নীলও না, যে দুটো খামের রং আমি চিনি। ওটা ছিল ফিরোজা, আর বন্ধ। হুলিতা ওটা দুই আঙুলে, এক কোণা ধরে রেখেছিল, যেন ছ্যাঁকা লাগছে।

"ডাকপিয়ন দিয়ে গেছে। লেখা আছে 'অসম্ভব ডেলিভারি দোকানে'। আমি অনেকক্ষণ খুলিনি।"

“কতক্ষণ?”

“আটাশ মিনিট,” তোনিও ওর বাক্স থেকে ঘড়ি দেখে বলল। “পাড়ার রেকর্ড।”

ও দোকানের ভেতরেও হেলমেট পরে ছিল, তাতে দুটো থাবার আঁচড়, আর ঘড়িটা হাতার বাইরে, যাতে হাতা গোটাতে সময় নষ্ট না হয়।

আমি হুলিতাকে চিনি। ওর হাতে বন্ধ খাম ততক্ষণই বন্ধ থাকে, যতক্ষণে ও ভাঁজটা খুঁজে পায়। আটাশ মিনিট ধৈর্য ছিল না। অন্য কিছু ছিল, আর কী, আমি বুঝলাম না।

ওটা আমার ছিল না। যে খাম আমার নয়, তার ওজন তিনগুণ। -হু.

মারা নখ দিয়ে খামটা খুললেন, দরকারের বেশি কাগজ না ছিঁড়ে। চিঠিটা স্পষ্ট হাতের লেখা, প্রাপ্তবয়স্কের, যে-লেখা লাইনের শেষে বেঁকে যায় না:

“আমি ইরেনে, কমিউনিটি সেন্টারের থিয়েটার ওয়ার্কশপের দায়িত্বে। ইনভেন্টরি হালনাগাদ করতে গিয়ে একটা লাইন পেয়েছি: ‘ভাঁজ-করা ছোট থিয়েটার: পাওয়া মুলতুবি’। ওটা কি আপনাদের কাছে আছে? শনিবার ৩১ তারিখে পাড়ার প্রতিযোগিতা। ছোট থিয়েটারটা যদি ভাঁজ করা অবস্থায় আমাদের উঠোনে পৌঁছায়, তিনজনের একটা দল বয়ে আনলে, আমি সেখানেই সই করব। নোয়ার দলে তিনজনের জায়গা আছে, আর আপাতত শুধু ও-ই আছে।”

তার নিচে, অন্য হাতের লেখায়, ছোট আর সোজা, ফিরোজা কালিতে:

“হুলিতা: আমি! এখন থিয়েটার করি। এমন কাউকে সঙ্গে এনো, যে পার্সেল বোঝে। —নোয়া”

হুলিতা নামটা পড়ল, আর ওর ঠোঁট এক দিকে উঠে গেল, শুধু এক দিকে, যেমন হয় কিছু মনে পড়লে, যেটা বলবে না। ও আস্তে “নোয়া” বলল, যেভাবে হাজারবার পেরোনো কোনো রাস্তার নাম বলে মানুষ।

“এমন কাউকে, যে পার্সেল বোঝে।” সেটা আমি। “পার্সেল” কথাটা আমার ভালো লাগল। “কাউকে” কথাটা কম।

পাঁচটায় ওরা দুজন এল।

ইরেনের হাতে একটা ফাইল, গায়ে অনেক পকেটওয়ালা নেভি-ব্লু ডেস্ট, আর গলায় ঝোলানো একটা হুইসেল। ছোট করে ছাঁটা ধূসর চুল, গোল চশমা, আর তা দিয়ে উনি তাক ধরে ধরে পুরো দোকানটা দেখলেন, যেন কেউ না বললেও ইনভেন্টরি করছেন। নোয়ার গলায় দড়িতে ঝোলানো একটা নোটবই, আর কানের পেছনে একটা ফিরোজা পেনসিল। চুল উঁচু খোঁপায় কোঁকড়া, একটা পুদিনা-সবুজ স্কার্ফে বাঁধা; সোয়েটার ফিরোজা, খামের মতো। ওর সবকিছু মনে হচ্ছিল খুঁজতে না হয় বলে নিজের জায়গায় রাখা।

হুলিতা কাউন্টারের পেছন থেকে বেরোল, ঝাঁপ না খুলে, নিচ দিয়ে, আর ওরা জড়াজড়ি করল। এত বেশি সময় জড়াজড়ি করল যে আমি মেপে নিলাম: এগারো সেকেন্ড। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, খাতা হাতে। খাতা এর জন্যও কাজে লাগে: হাতে কিছু রাখার জন্য।

“এ গুনি,” হুলিতা বলল। “পার্সেল বোঝে।”

“হ্যালো, পার্সেল-বোঝা গুনি,” নোয়া বলল। আর ওর নোটবইয়ে আমার নামটা লিখে নিল।

পুরো নামটাই লিখল, ওই উপাধিসহ, যেটা ও এইমাত্র আমাকে দিয়েছে। যেখান থেকে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, দেখলাম, আমি পাতার দ্বিতীয় লাইন। প্রথমটায় লেখা “হুলিতা”, আর তার নিচে একটা দাগ, যেমন দেওয়া হয় যা হয়ে গেছে তার নিচে।

মারা নীল টুলে উঠে তাক থেকে ৬ নম্বরটা নামালেন। সবগুলোর মতোই একটা বাক্স, বড়ও না, ছোটও না। লেবেলে টাইপ করা পাঁচটা লাইন: নং ৬. উঠোনের ওয়ার্কশপ. দুই দরজা দিয়ে প্রবেশ. ভাঁজ করা অবস্থায় পৌঁছে দিন. আর নিচে, যথারীতি, প্রেরক: র.। চারপাশে ফেরত-এর নয়টা সিলমোহর।

“নয়টা সিলমোহর,” হুলিতা বলল।



“‘দুই দরজা’,” নোয়া পড়ল। “কোন দুটো দরজা?”

ইরেনে জানতেন না। মারাও না। আমি একটা প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে লিখে রাখলাম, যেটা আমি লিখি যখন কিছু জানি না আর চাই যে লেখা থাকুক, আমি খেয়াল করেছি।

“আমি ওটা নয়বার নিয়ে গেছি,” মারা বললেন। “সোমবারে আমাকে ডাকত সেলাই। বুধবারে, কোরাস। শুক্রবারে, দাবা। ‘ওয়ার্কশপ? এখানে নয়।’ একটা ওয়ার্কশপের জন্য কেউ সই করত না।”

ওঁর কথা বলতে বলতেই আমি এঁকে ফেললাম, তিনটে ঘরে: মারা, বাক্স বগলে, একই দরজার সামনে, আর দরজায়, পালা করে, সুতো-সুঁই, একটা সুরের চিহ্ন আর একটা দাবার ঘোড়া, যেটা কিছু বলছিল না, কারণ দাবায় চুপ করে থাকতে হয়। নিচে, ভোরবেলা দোকানের জানালা দিয়ে বাক্সটা ঢুকছে। নয়বার।

“থিয়েটার মহড়া দেয় উঠোনে,” ইরেনে বললেন। “আর উঠোনে কোনো ঘণ্টি নেই।”

উনি ফাইল খুলে মারাকে সেন্টারের সিল দেওয়া একটা কাগজ দেখালেন। মারা কাগজটা নাক খুব কাছে এনে পড়লেন, যেভাবে উনি পড়েন যা গুরুত্ব দিয়ে নেবেন ঠিক করেছেন।

"এখন রেজিস্টারে আছে: 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ। দায়িত্বে: ইরেনে'। একটা ওয়ার্কশপের জন্য এখন কেউ সই করে।"

"এখন যখন সই করার লোক আছে, মারা ওটা নিজের বাক্সের ভেতরে করে নিয়ে যান না কেন, এলিয়ার স্ট্যান্ডের মতো?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

"আমার বাক্সে আমি ওটা নয়বার নিয়ে গেছি," মারা বললেন। "এখন শর্ত ঠিক করবেন যিনি পার্সেল গ্রহণ করছেন।"

"ভাঁজ-করা ছোট থিয়েটার তো চত্বরে চত্বরে নিয়ে যাওয়ার জন্য," ইরেনে বললেন। "আমি দেখতে চাই, আমার ছেলেমেয়েরা ওটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে পারে কি না। না পারলে, ওটা আমার কাজে লাগবে না। আর যা আমার কাজে লাগে না, তাতে আমি সই করি না।"

"এটা আমি আগেও শুনেছি, একটা বেকারিতে," মারা বললেন।

আমার একটা প্রশ্ন ছিল, চিঠিটা পড়ার পর থেকেই, আর ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই করে ফেললাম।

"আর তিনজন কেন লাগে?"

আমি সত্যিই জিজ্ঞেস করেছিলাম। দুটো হাতলওয়ালা একটা বোঝা; দুজন মানুষ, প্রতি হাতলে একজন। আঙুলে গুনে দেখেছিলাম, দুজনই হয়।

কেউ হাসল না। ইরেনে আমার দিকে চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন, যেভাবে তাকায় মানুষ এমন একটা টুকরোর দিকে, যেটা যতটা মনে হয়েছিল তার চেয়ে ভালো এঁটে যায়।

"ভালো প্রশ্ন। মঙ্গলবার, উঠোনে, তোমরাই আমাকে উত্তর দেবে।"

মারা নিজের বই খুলে নিজের শর্তগুলো লিখলেন। মারার শর্ত সবসময় এক হাতে এঁটে যায়; আমি নিজের হাত দিয়ে গুনলাম, বুড়ো আঙুলটা বাড়তি রইল:

- ৬ নম্বর: মহড়ার জন্য ধার দেওয়া।
- ইরেনের সঙ্গে বা আমার সঙ্গে বেরোবে।
- ভাঁজ করা অবস্থায় ফিরবে।
- এখানে ঘুমোবে।

লেবেল থাকবে বাক্সে, আর বাক্স মারার কাছে।

ও যদি নিজের তাকেই ঘুমোয়, ভোরে ফিরে যাওয়ার মতো কোথাও থাকে না। তাই নয়টা সিলমোহরেই থেকে যায়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। -হু.



মঙ্গলবার আমরা কমিউনিটি সেন্টারের উঠোনে গেলাম। ফুটপাত থেকে ঢুকতে হয় একটা লোহার ফটক দিয়ে, যাতে রঙের অনেক স্তর, আর যেটা নিজে থেকে বন্ধ হয়: ছেড়ে দিলে আস্তে আস্তে ফিরে আসে, ক্লিক করে লাগা পর্যন্ত, যেন একটা কুকুর, যে না বলতেই বসে পড়ে।

মারা বাক্সটা মাটিতে রেখে ঢাকনা খুললেন। বেরোতেই ছোট থিয়েটারটা বড় হয়ে উঠল, এলিয়ার স্ট্যান্ডের মতো। আমি আর ভয় পাই না: ফিতে বের করি।

বন্ধ অবস্থায় ওটা ছিল কাঠের প্যানেল আর কাপড়ের একটা চ্যাপ্টা বোঝা, দু পাশে একটা করে হাতল, আর একটা বেল্ট, যেটা তিন ফুটোর একটা বকলসের ভেতর দিয়ে গেছে। এক মিটার বাই সত্তর সেন্টিমিটার, আর কাত করলে একটা বিঘত। ফটকের একটা পাল্লা খোলা থাকলে, নব্বই সেন্টিমিটার। কাত করে ধরলে ফটক দিয়ে ঢুকে যেত। সেটাই ছিল সহজ কাজ।

সবার আগে ইরেনে দেখতে চাইলেন ওটা আস্ত আছে কি না। বেল্ট খুলে বোঝাটা ঘোরালেন। প্যানেলগুলো নিজের ওজনে নিজে থেকে খুলে গেল, একটার পর একটা:

ক্‌ল্‌যাক, ক্‌ল্‌যাক, ক্‌ল্‌যাক। তিন দেয়ালের একটা মঞ্চ, একটা ছোট পর্দা, আর পেছনের প্‌যানেলে ফ্রেমওয়ালা একটা জানালা।

জানালা দিয়ে তোনিওকে দেখা যাচ্ছিল, ফুটপাত দিয়ে একটা স্‌যান্ডউইচ নিয়ে যাচ্ছে। মুখ ভর্তি ছিল। অভিবাদন জানাতে পারল না। একটু থমকে দাঁড়িয়ে রইল, ফ্রেমে বাঁধা, হেলমেট মাথায়, একটা গাল আরেকটার চেয়ে ফোলা, যেন খাওয়ার সময় আঁকা কোনো গণ্‌যমান্‌য মানুষের ছবি।

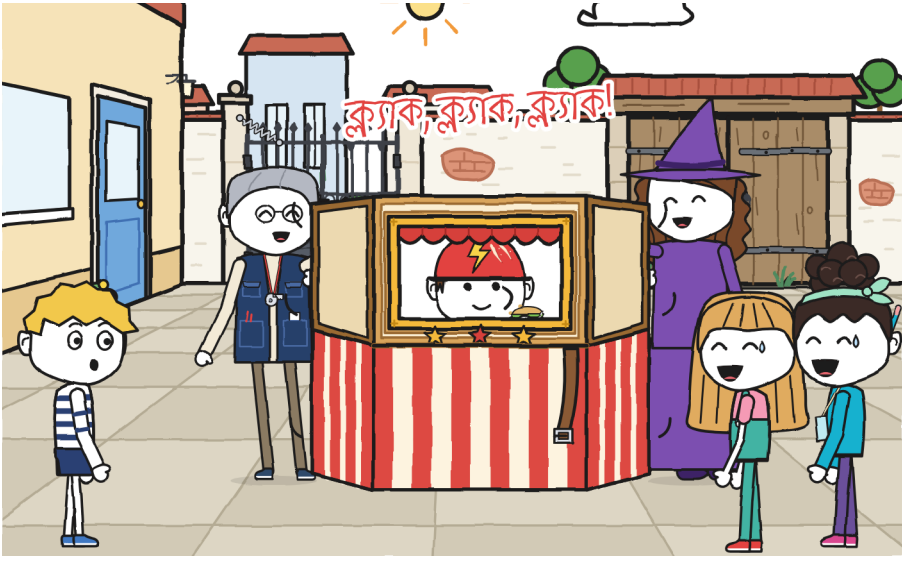

“আস্ত আছে,” ইরেনে বললেন। “ওয়ার্কশপের নিয়ম: হাত হাতলে। কবজায় কখনও নয়। আর বাঁকে, কেউ একজন বেল্টটা ধরবে।”

আমি ঠিক তা-ই লিখে রাখলাম।

ইরেনে আর মারা ছোট থিয়েটারটা ভাঁজ করে বেল্ট আটকালেন।

“আমরা পরীক্ষা করি,” হুলিতা বলল। নোয়া তখনই অন্‌য হাতলে।

ঠিক করার জন্য ওরা একে অন্যের দিকে তাকাল না। বলল না পর্যন্ত: প্রত্যেকে নিজের দিকে গেল, যেমন যায় মানুষ নিজের চেনা চেয়ারে।

ওরা তিন গুনে ওটা তুলল। পারল। উঠোনে একপাক ঘুরল, আস্তে, কনুই একটু ছড়িয়ে, আর ছোট থিয়েটারটা দুজনের মাঝখানে দুলল না, যেন একটা ঠিকঠাক বওয়া ট্রে। ওরা ফটক পর্যন্ত পৌঁছাল। ফটকটা বন্ধ ছিল।

হুলিতা ওটার দিকে তাকাল। নোয়া তাকাল। ওদের চারটে হাত, আর চারটেই ব্যস্ত।

আমি দুই মিটার দূরে, আমার দুটো হাতই খালি, আর একটা খাতা।

ইরেনে, পেছনে, ফাইল বুকে চেপে, কিছু বললেন না। "ওদের সাহায্য করো" না, "তুমি" না।

আমি পিঠ দিয়ে ফটকটা ধরে রাখলাম। ওরা পেরোল। ইরেনে ফাইলে কিছু একটা লিখলেন।



সেই বিকেলে আমি এই খাতার যন্ত্রটা বানালাম। আমার কর্মজীবনে এটা পঞ্চম, কাঁপুনি-মিটার, লাল-মিটার, এখানে-মিটার আর হইচই-মিটারের পর, আর প্রথম, যেটা একজন মানুষকে মাপে না, একসঙ্গে কয়েকজনকে মাপে। নাম দিলাম তিনজনের মিটার, "প্রতিটা অংশে কে কী করে"। প্রতি অংশে একটা সারি আর তিনটে ঘর, প্রত্যেকটায় একটা ছোট ছবি:

- বওয়া: দুই হাত, দুই হাতলে।
- দিক দেখানো: কোন দিক দিয়ে আর কখন, বলা।
- পথ করে দেওয়া: দরজা, ফুটপাতের ধাপ, মানুষ।

প্রথম সারিতে, "উঠোন, প্রথম চেষ্টা", আমি লিখলাম "হুলিতা আর নোয়া", "হুলিতা আর নোয়া" আর একটা ফাঁকা ঘর। দ্বিতীয়তে, "উঠোন, দ্বিতীয় চেষ্টা", একই, কিন্তু তৃতীয় ঘরে লিখলাম "গুনি"।

দুটো নাম বারবার আর একটা ঘর ফাঁকা: পার হওয়া যাবে না। ঘরটা ভরা থাকলে, যাবে। ইরেনের জন্য উত্তরটা আমার কাছে ছিল, আর সেটা আমার নিজের।

আর আরেকটা জিনিসও লিখে রাখলাম, আরও ছোট: "ফটক একটা পাথরও ধরে রাখতে পারে"।

আমি ওটা লিখলাম পেনসিল প্রায় না চেপে।



লেবেলটা বোঝা বাকি ছিল।

"দুই দরজা মানে ফটকের দুটো পাল্লা," হুলিতা বলল।

"দুটোই খুলতে হবে," নোয়া বলল।

"আগে বাইরে থেকে পাঁচিলটা মেপে দেখতে পারি," আমি বললাম।

আমরা তিনজন একসঙ্গে আঙুল দেখালাম। হুলিতা, ফটক। নোয়া, ওয়ার্কশপের ঘর। আমি, রাস্তা।

"পরে," ওরা দুজন বলল।

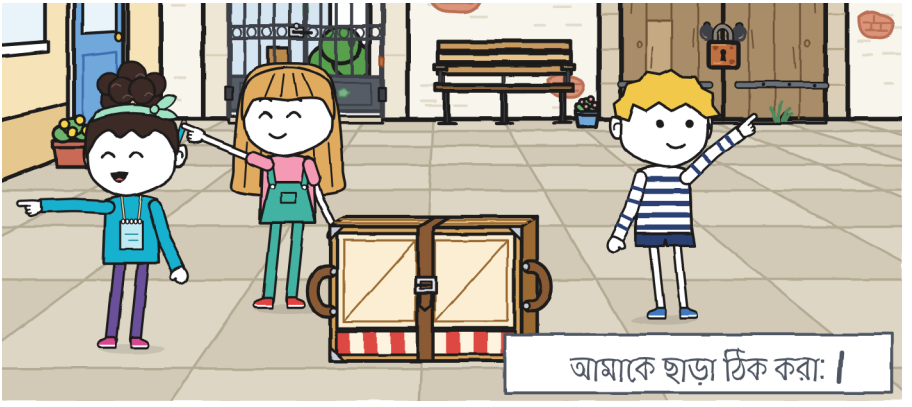

ওরা একসঙ্গে বলল, একই সুরে, যেন মহড়া দিয়েছে। মহড়া দিয়েছিলই, আমার মনে হয়। বছরের পর বছর ধরে।

আমি একাই গেলাম। ফটক দিয়ে বেরোলাম, যেটা পেছনে ক্লিক করে বন্ধ হলো, আর ফিতে দিয়ে মাপতে মাপতে পাঁচিল ঘুরলাম, অংশে অংশে, হাঁটুতে খাতা রেখে প্রতিটা সংখ্যা লিখে। পাঁচিলটা লম্বা, আর একটা সরু গলিতে গিয়ে মিশেছে, যেখানে স্থির জলের গন্ধ। আর সেখানে, মোড়ের ওপাশে, আমি একটা জিনিস পেলাম।

আমি তাড়াতাড়ি ফিরলাম, মাথায় সেই জিনিসটা নিয়ে, ফিতেটা তখনও গুটোনো হয়নি, ফুটপাতে এক মিটার হলুদ টেনে। ঢুকে দেখি, হুলিতা আর নোয়া এমন কিছু নিয়ে হাসছে, যা ঘটেছিল আমি পাড়ায় আসার আগে। ওরা কাঁধ দিয়ে হাসছিল, শব্দ না করে, আর নোয়া হুলিতার হাত ছুঁয়ে ওকে থামাতে চাইছিল, আর হুলিতা থামছিল না।

আমি মুখ খুললাম।

“ঠিক হয়ে গেছে, গুনি,” হুলিতা বলল। “দুটো পাল্লা।”

পাতার নিচের কোণে, ছোট করে, পেনসিলে, আমি লিখলাম: আমাকে ছাড়া ঠিক করা। আর পাশে, একটা দাগ। মুখ খোলা অবস্থাতেই ওটা লিখলাম।

আমি মুখ বন্ধ করলাম। আর খাতাও।

ওই দাগটা আমি দুদিন পরে দেখেছি। ওটা আমার ছিল। -হু.



অধ্যায় ২

কে পথ চেনে?

বুধবার ছিল প্রথম যাত্রা: দোকান থেকে উঠোন পর্যন্ত, রাস্তা দিয়ে, ছোট থিয়েটার কাঁধে নিয়ে আর লোকের চোখের সামনে দিয়ে। বিকেলের ক্লাসটা আমার কেটেছিল একটা শিটের মার্জিনে মিটারটা এঁকে, একটা নতুন সারি আর ফাঁকা ঘরগুলো নিয়ে, তিনজনে মিলে ভরার জন্য।

দোকানে পৌঁছে দেখি, মিটার ভরা হয়ে গেছে। সবুজ কালিতে।

হুলিতা আমার খাতাটা যন্ত্রের পাতায় খুলে নতুন সারিটা যোগ করে ফেলেছিল, ওর বিজ্ঞাপনের মতো অক্ষরে: "দোকান → উঠোন"। বওয়ার ঘরে লেখা "গুনি আর নোয়া"। দিক দেখানোর ঘরে, "হুলিতা"। পথ করে দেওয়ার ঘরে, আবারও "হুলিতা"। মার্কারটা ওপরেই পড়ে ছিল, খোলা, এমন প্রমাণের মতো, যেটা লুকোনোর কষ্ট কেউ করেনি।

"তুমি আর নোয়া বইবে," হুলিতা বলল। "আমি দিক দেখাই, আমি তো পথ চিনি। আর আমি সামনে থাকব বলে পথও করে দেব।"

"আসতে আসতেই আমরা ঠিক করে নিয়েছি," নোয়া বলল।

ও এটা জেতার জন্য বলেনি। ও বলল যেভাবে ঠিকানা দেয় মানুষ: কারণ কথাটা সত্যি ছিল। ওরা কোথাও থেকে একসঙ্গে এসেছিল, আর পথেই ভেবে নিয়েছিল। আমি,

আমার নিজের পথে, একই কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু একটা শিটের মার্জিনে, আর সেটা আসা বলে গণ্য হয় না।

সবুজ কালি মোছে না। দ্বিতীয় দাগ।



"বেরোনোর আগে আমরা একটা নকশা বানাতে পারি," আমি বললাম। "বাঁকগুলোতে নম্বর দিয়ে।"

আমার মাথায় ওটা অর্ধেক তৈরি ছিল: দোকানের দরজা, ফুটপাতের ধাপ, জুতোর দোকান, ছোট চত্বর, বাঁকগুলো একটা বৃত্তের ভেতর নম্বর নিয়ে, যেন ট্রেনের স্টেশন।

"নকশা লাগবে না," হুলিতা বলল। "খোঁড়া মাছ পর্যন্ত সোজা।"

নোয়া হেসে উঠল। হুলিতাও। ছোট হাসি না: যে হাসি একজনের থেকে শুরু হয়ে প্রথমজনের শেষ হওয়ার আগেই অন্যজনকে ছুঁয়ে ফেলে, আর ফিরে আসে, আর তখন আর বোঝা যায় না কার।

"কোন মাছ?"

"খোঁড়া মাছ মানে খোঁড়া মাছ," নোয়া বলল, তখনও দুমড়ে।

"একটা লম্বা গল্প," হুলিতা বলল।

"আর খুব ভালো," নোয়া বলল।

আমি অপেক্ষা করলাম। পেনসিলটা হাওয়ায় ধরা ছিল, গল্পটা টুকে নেওয়ার জন্য তৈরি, যদি পথের কাজে লাগে। ওরা আমাকে বলল না। আস্তে আস্তে শান্ত হলো, হাতা দিয়ে চোখ মুছে, আর যখনই একজন অন্যজনের দিকে তাকাচ্ছিল, একটু একটু ফিরে আসছিল, হেঁচকির মতো।

আমি পেনসিল নামালাম। তৃতীয় দাগ।

মারা দোকানের দরজায়, ফুটপাতে, বাক্স থেকে ছোট থিয়েটারটা বের করলেন, আর বাক্সটা থেকে গেল ভেতরে, ওর লেবেল আর নয়টা সিলমোহরসহ। নোয়া বেল্টটা প্রথম ফুটোয় আটকাল।

"এভাবে পৌঁছে আমরা তাড়াতাড়ি খুলতে পারব।"

কারণটা ভালো ছিল। আমি লিখে রাখলাম: "ফুটো ১: তাড়াতাড়ি খোলে"। বাকিটা লিখলাম না, কারণ বাকিটা তখনও জানতাম না।

আমি সামনে, নোয়া পেছনে, প্রত্যেকে নিজের হাতলে এক হাত দিয়ে। সামনে থেকে রাস্তা দেখা যায়। পেছনে শুধু ছোট থিয়েটারটাই দেখা যায়: এক মিটার কাঠ আর রং-করা কাপড়, নাক থেকে এক বিঘত দূরে, যেন একটা আলমারির পেছনে হাঁটা। নোয়া অন্য হাতটা বেল্টের কাছে রেখেছিল, অভ্যাসে বা ইরেনের নিয়মে, আর নিচু গলায় গুনছিল। পা গুনছিল। সামনে থেকে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম: "...একুশ, বাইশ...", ঠিক সেই সুরে, যে সুরে অন্যরা গুনগুন করে।

ইরেনে আসছিলেন সবার শেষে, ফাইল আর হুইসেল নিয়ে। উনি কোন দিক দিয়ে বলছিলেন না। উনি "থামো" বলছিলেন, যখন ফুটপাতের ধাপ আসছিল। একবারই বলছিলেন, গলা না চড়িয়ে, আর আমরা থামছিলাম, আর মনে হচ্ছিল গোটা রাস্তাটাই আমাদের সঙ্গে থেমে গেল।

হুলিতা পথ করে দিচ্ছিল খুব ভালো। কয়েক পা সামনে, উল্টো হেঁটে আর হাত নাড়িয়ে, যেন কেউ ট্রাক পার্ক করাচ্ছে।

"সরো, থিয়েটার যাচ্ছে!"

জুতোর দোকানের মালকিন দরজায় বেরিয়ে এলেন দেখার জন্য, হাতে অর্ধেক-বাঁধা একটা জুতো। কুকুর নিয়ে এক ভদ্রলোক একটা সদর দরজার আড়ালে অপেক্ষা করলেন; কুকুরটাও অপেক্ষা করল, যেটা আরও কঠিন। অনেক দূরে, পাড়ার ওপাশে, একটা ঘণ্টি বাজল। টিং-টিং।

“বিজলি ওদের প্রতিযোগিতার মহড়া দিচ্ছে,” নোয়া বলল। “ওরা যাচ্ছে সাইকেলে, একটা খাম নিয়ে। আমরা যাচ্ছি পায়ে হেঁটে, এটা নিয়ে।”

“এটা নিয়ে ছোটা যায় না,” ইরেনে বললেন।

সোমবার তোনিও আমাকে বলেছিল: বিজলির প্রতি স্টেশনে তিনজনকে একসঙ্গে পৌঁছাতে হয়, নইলে চলে না। আমি তখন লিখে রেখেছিলাম, কীসের জন্য জানতাম না।



আমরা ফোয়ারার ছোট চত্বরে পৌঁছালাম। ওটা গোল, চারপাশে বেঞ্চ, আর কিছু পায়রা, যারা কারও জন্য সরে না। হুলিতা ঘুরে দাঁড়াল, নির্দেশটা চেঁচিয়ে দিয়ে মাঝখানের দিকে ছুটে গেল, ফটকটা ধরে রাখতে রাখতে যাবে বলে।

“খোঁড়া মাছ পর্যন্ত, তারপর বাঁক!”

আর ও আর নেই। দুজন মানুষের মাঝখানে এক মুহূর্ত ওর ওভারঅলটা দেখা গেল, তারপর কিছু না।

ফোয়ারার মাঝখানে একটা পাথরের মাছ, একটা ছোট থামের মাথায়, মুখ হাঁ করা, যেন কিছু বলতে যাচ্ছিল আর ভেবে বদলে নিয়েছে। আমি ভালো করে দেখলাম। আমার দিক থেকে ওর সবগুলো পাখনা ছিল।

আমি তাড়াতাড়ি ভাবলাম, যেটা আমার কাজ না। আমার কাজ আস্তে ভাবা, একটা স্কেল নিয়ে। কিন্তু ছোট থিয়েটারটা ভারী ছিল, নোয়া পেছনে কিছু না দেখে, আর রাস্তা চারপাশে চলছিল। আমি খাতাটা হাতলে ঠেকিয়ে দুটো লাইন লিখলাম:

১. ফোয়ারার মাছ: পাখনা সব দেখা যাচ্ছে। খোঁড়া নয়। আরেকটা মাছ থাকবে।
২. বাঁক: কোন দিকে? বাঁয়ে, সরু রাস্তা। ডানে, চওড়া রাস্তা। ছোট থিয়েটার চওড়া দিক দিয়ে ভালো যায়।

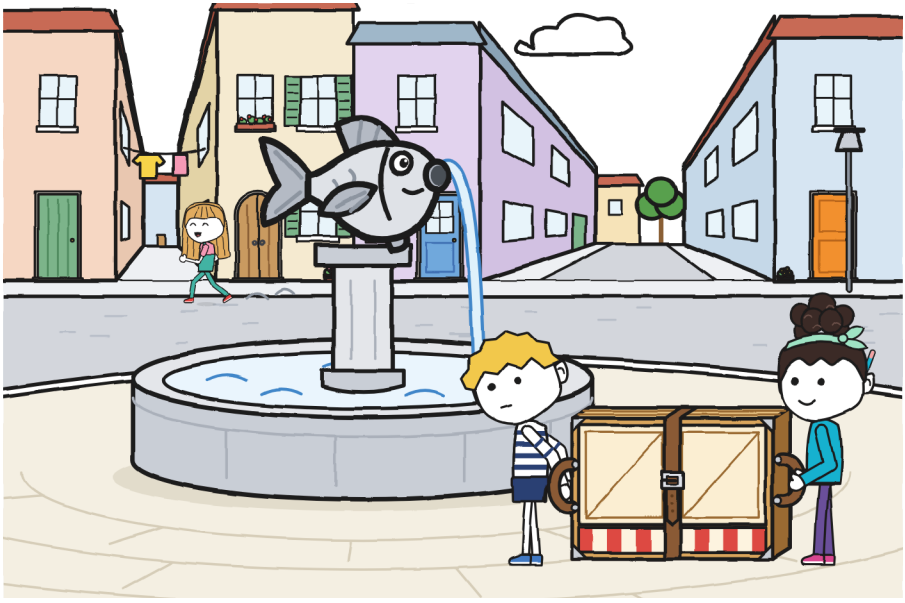

নিচে, একটা মোটা তির, ডান দিকে। যুক্তিটা নিখুঁত ছিল। শুধু শুরুটা ভুল ছিল।

“এখনই বাঁক নেব?” আমি পেছনে জিজ্ঞেস করলাম।

“খোঁড়া মাছের কাছে!” নোয়া ছোট থিয়েটারের পেছন থেকে বলল।

নোয়া কাঠ ছাড়া কিছু দেখছিল না। ওখান থেকে খোঁড়া মাছ একটা কথা, আর কথাটা ঠিকঠাক বলা হয়েছিল।

আমি আরেকটা মাছ খুঁজতে থাকলাম। সদর দরজা দেখলাম, সাইনবোর্ড দেখলাম, একটা মাছের দোকান, যেটা দেখা গেল আসলে একটা হার্ডওয়্যারের দোকান। ছিল না। আমি ডানে বাঁক নিলাম।



কেউ “বাঁক” বলল না। কেউ বেল্ট ধরল না। প্রথম ফুটোয় বকলস বেশিক্ষণ টেকে না।

ক্‌ল্‌যাক। ক্‌ল্‌যাক। ক্‌ল্‌যাক।

প্‌যানেলগুলো আস্তে আস্তে খুলে গেল, একটার পর একটা, নোয়াকে ঘিরে, যেন আর্টিচোকের পাতা, যেটা কেউ ভেতর থেকে খুলছে। ইরেনে হুইসেল বাজালেন। আওয়াজ থামলে, রাস্তার মাঝখানে একটা থিয়েটার। আর থিয়েটারের ভেতরে, নোয়া।

“হ্‌যালো,” ও জানালা দিয়ে বলল।

ওর হাত দুটো ওপরে, কবজা থেকে দূরে, যেমন ওকে বলা হয়েছিল। বেল্টটা মাটি পর্যন্ত ঝুলছিল। আমার হাতে তখনও আমার হাতলটা, যেটা আর কিছুর হাতল ছিল না: একটা মঞ্চের কিনারা।



ইরেনে নোয়ার হাত দুটো দেখলেন। তারপর আমার হাত দুটো। সত্যিই দেখলেন, আঙুল ধরে ধরে, দু দিক থেকে। সবগুলো আস্ত ছিল: প্‌যানেল হালকা, আর খোলেও ধীরে।

“কে দিক দেখাচ্ছিল?” জিজ্ঞেস করলেন।

কেউ উত্তর দিল না। যে দিক দেখাচ্ছিল, সে তখন দুটো রাস্তা পেরিয়ে একটা ফটক ধরে রাখছিল।

আমরা ইরেনে আর আমি ওটা ভাঁজ করলাম, হাত দুটো পাশের দণ্ডে, তাড়াহুড়ো না করে, প্যানেল প্যানেল করে। নোয়া, বাইরে এসে, বেল্টটা আটকাল, আর এবার দুবার টানল। এর মধ্যে আমি মাপলাম: আমার পা থেকে ফোয়ারা, চার মিটার। আমি ওটা লিখলাম ফিতে তখনও মাটিতে টানটান, আমার জুতো থেকে পাথরের কিনারা পর্যন্ত।



হুলিতা ছুটতে ছুটতে ফিরল।

"কিন্তু ওটা তো খোঁড়া মাছের কাছে ছিল!"

"কোন খোঁড়া মাছ?"

"ওই যে!" ও ফোয়ারার দিকে দেখাল। "বাঁ দিকে। যেমন সবসময়।"

"'সবসময়' মানে যখন আমি ছিলাম না।"

আমি রাগ করে বলিনি। বললাম যেভাবে তারিখ শুধরে দেয় মানুষ। হুলিতার হাত ফোয়ারার দিকে এক সেকেন্ড বেশি বাড়ানো রইল, তারপর ও ইরেনের দিকে ঘুরল, যাঁর ফাইল খোলা।

"আসলে গুনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে।"

আমি হারাইনি। আমি ঠিক জানতাম কোথায় আছি: ফোয়ারা থেকে চার মিটার দূরে। এইমাত্র মেপেছি।

নোয়া আমাদের একজনের দিকে তারপর আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছিল, নোটবইটা সোয়েটারে চেপে। ইরেনে কিছু একটা লিখলেন। কী, বললেন না।

ওটাও ওরা আমাকে ছাড়া ঠিক করল। চতুর্থ দাগ।

আমি কথাটা জোরে বলেছিলাম, লোকজনের সামনে। জানি। -হু.

ওরা আমাকে মাছটার অন্য দিক দেখাল। আমরা তিনজন ফোয়ারা ঘুরলাম, ভাঁজ করা ছোট থিয়েটার নোয়া আর আমার মাঝখানে, ইরেনে পেছনে। ওর একটা পাখনা

নেই, বাঁ দিকেরটা। দোকানের রাস্তা দিয়ে এলে ওটা দেখা যায় না: মাছ তোমাকে ভালো দিকটা দেখায়, ছবি তোলার সময় যারা পোজ দেয় তাদের মতো। ওটা দেখতে হলে জানতে হয় যে ওটা নেই।

আমি ওটা দুই দিক থেকেই আঁকলাম, পাশাপাশি। একই মাছ, দুটো মাছ।

আমরা বাঁকটা আবার করলাম। কয়েক মিটার পিছিয়ে গেলাম, রাস্তার মুখে, আর আবার করলাম, এবার হুলিতা আমার পাশে। প্রথমবার আমি "বাঁক" বললাম খুব তাড়াতাড়ি, আর নোয়া একটা সদর দরজার সামনে বেল্ট ধরল, অকারণে। দ্বিতীয়বার, খুব দেরিতে: ছোট থিয়েটারের অর্ধেক তখনই বাঁকে আর নোয়া হাতড়ে বেল্ট খুঁজছে। তৃতীয়বার হলো। ভালোভাবে হলো, ক্ল্যাক ছাড়া। কিন্তু কেউ কথা বলছিল না। হুলিতাও না, যে সবসময় বলে।

তখন বিজলি এল রাস্তা দিয়ে: জোয়ে, ব্রুনো আর তোনিও, এক লাইনে, হাত হ্যান্ডেলে। মোড়ে টিং-টিং। জোয়ে সামনে, বিনুনি হাওয়ায়; ব্রুনো মাঝখানে, ঝুড়িতে খাম; তোনিও শেষে, ঘণ্টিতে এক আঙুল। ওরা ব্রেক না করে, একে অন্যকে না ছুঁয়ে ফোয়ারা ঘুরে গেল, সারাক্ষণ একজনের থেকে আরেকজনের একই দূরত্বে, ঘড়ির কাঁটার মতো, যারা কখনও একে অন্যকে ধরে না।

"স্টেশন এক, প্রথমবারেই," যেতে যেতে তোনিও বলল।

ও আমাদের জন্য বলেনি। তোনিও তথ্য জোরে ঘোষণা করে, কেউ শোনার না থাকলেও; এটাই ওকে বিজলির করে। কিন্তু আমরা শুনলাম।

হুলিতার হাত দুটো ঝুলে ছিল। হুলিতার হাত কখনও ঝুলে থাকে না: যায়, আসে, দেখায়, পথ করে দেয়। সেদিন বিকেলে, ঘণ্টিটা চলে যেতে যেতে, ও দুটো পাশে ঝুলে ছিল, ছোট থিয়েটার ছাড়া দুটো হাতলের মতো।

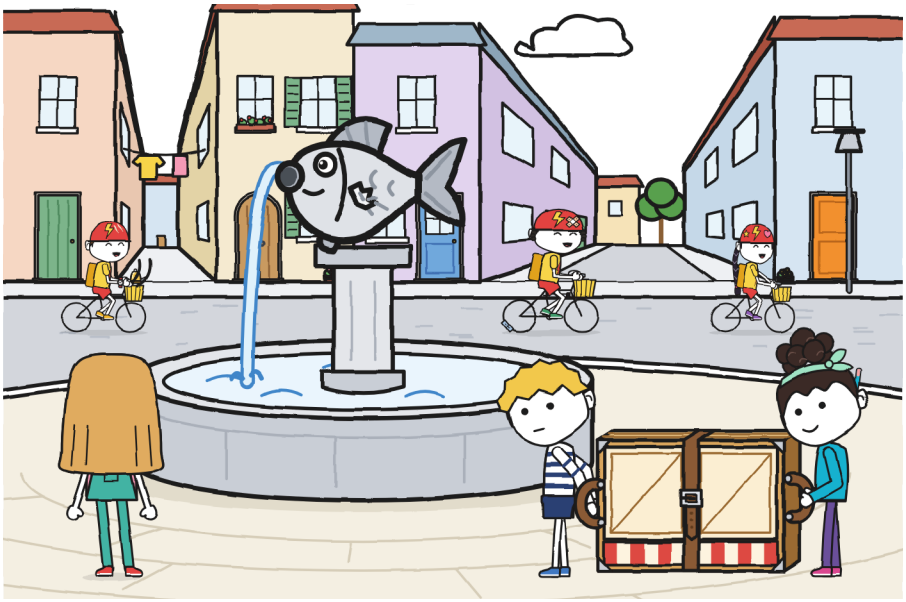

আমরা প্রায় রাতে উঠোনে পৌঁছালাম। শেষ অংশে দিক দেখানোর দরকার হয়নি: ফটক চোখের সামনেই। হুলিতা ওটা হাত দিয়ে ধরল আর "সরো!" বলল না। মারা ভেতরে অপেক্ষা করছিলেন। ছোট থিয়েটারটা বাক্সে রেখে দোকানে নিয়ে গেলেন, নিজের তাকে ঘুমোতে।

আমি আজকের হিসেব মিটারে লিখলাম, সবুজ সারির নিচে, আর একটা নতুন কলাম যোগ করলাম, সরু, পেনসিলে: "খুলে গেল · আবার করা ৩ বার"। তিনটে ঘরেরই নাম ছিল, তবু রাস্তায় একটা থিয়েটার খুলে গিয়েছিল। মিটারে কিছু একটা কম ছিল। কী, বুঝলাম না। পাশে একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন আঁকলাম, যে মাপের চিহ্ন আমি দিই যখন প্রশ্নটা পাড়ার নয়, যন্ত্রের।

আমার নাম ওই সারিতে দুবার আছে। আর আমি দুটোর একটাতেও ছিলাম না। -হু.

বাড়িতে, রাতের খাবারের পর, আমি টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে টেবিলে বসে খাতাটা শেষ পাতায় খুললাম।

সেখানে আমি মঙ্গলবার পাঁচিলের পেছনে যা পেয়েছিলাম, তা আঁকলাম। যত্ন করে, স্কেল দিয়ে, যে মিটারগুলো হাঁটুতে খাতা রেখে লিখেছিলাম, তা দিয়ে। খুব ভালো হচ্ছিল। এত ভালো যে আমি পেনসিল থামিয়ে ওটা কিছুক্ষণ দেখলাম।

মা দরজা দিয়ে মাথা বাড়াল শুভরাত্রির জানাতে। ততক্ষণে আমার হাত আঁকাটার ওপর। মা শুভরাত্রির বলল, আমার হাতের দিকে তাকাল, কিছু জিজ্ঞেস করল না, আর দরজা বন্ধ করে দিল।

আমি ওটা হাত দিয়ে ঢাকলাম, যদিও আমি একাই ছিলাম। একদিক দিয়ে পাঁচিলের একটা টুকরো আর আধখানা তালা উঁকি দিচ্ছিল।

ভাবলাম: "কাল ওরা আবার ভুল করবে। তখন আমি বের করব।"

পরিকল্পনাটা আমার ভালোই মনে হলো। সময়ও ঠিক করা ছিল।

এই পাতাটা আমি বৃহস্পতিবার পড়েছি। ভালো লাগেনি। বুধবারেরটাও না। -হু.



অধ্যায় ৩

গুনির নকশাটা কি কাজে লাগে?

সেই রাতে, হাত ঢাকতে ঢাকতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর, আমি পুরো নকশাটা বানালাম।

ওপর থেকে দেখা উঠোন, যেমন পায়রারা দেখে। পাঁচিলটা মাপা, অংশে অংশে, মঙ্গলবার হাঁটুতে লিখে রাখা সংখ্যাগুলো দিয়ে। ফটক, নিজে থেকে বন্ধ হওয়ার তিরসহ। ফোয়ারা, মাছটা তার খারাপ দিক থেকে আঁকা, যাতে আর কাউকে না ঠকায়। দোকান, এক কোণে, ছোট। তিনটে অংশ, বৃত্তের ভেতর নম্বর দিয়ে। আর পাঁচিলের পেছনে, মঙ্গলবারেরটা।

নকশাটা খুব ভালো হলো। আমার আঁকা সেরাগুলোর একটা, আর আমি অনেক এঁকেছি। আমি টেবিল-ল্যাম্পটা কাত করে কিছুক্ষণ ওটা দেখলাম, যাতে পেনসিলের ছায়া না পড়ে। তারপর চার ভাঁজ করলাম, নখ দিয়ে ভাঁজগুলো চেপে, আর খাতার ভেতর রাখলাম, এমন দুটো পাতার মাঝখানে, যাদের এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।



বৃহস্পতিবার, দোকানে, নোয়া গুনছিল।

ও ফুটপাতে, শোকেসের সামনে, ফুটপাতের ধাপের দিকে হাঁটছিল লম্বা লম্বা পায়ে, সবগুলো সমান, নিজের পায়ের দিকে না তাকিয়ে। সামনে তাকিয়ে ছিল, যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে, আর ঠোঁট নড়ছিল।

“দরজা থেকে ফুটপাতের ধাপ, ছয় পা। ধাপ থেকে ল্যাম্পপোস্ট, এগারো।”

“ওটা ফিতে দিয়ে মাপে,” আমি বললাম।

“আমি পা দিয়ে মাপি। ওগুলো আমার সবসময় পরা থাকে।”

আমি ভাবলাম। কথাটা সত্যি ছিল: ফিতে বের করতে হয়, টানতে হয়, পা দিয়ে চেপে ধরতে হয়, তারপর ওটা নিজে গুটিয়ে যায় আর আঙুলে কামড় দেয়। পা বাড়িতে ভুলে আসা যায় না।

“তোমার এক পা কত?”

“এক।”

আমি ওর এক পা মাপলাম। দোকানের মেঝেতে ফিতেটা টান করলাম, আর নোয়া ওটার ওপর একটা লম্বা পা ফেলল, ওর নিজের মতো, না ভেবে, যেভাবে মানুষ সই করে। আমি নিচু হয়ে দাগটা পড়লাম: আটান্ন সেন্টিমিটার। ও ওর নোটবইয়ে লিখল। আমি, আমার খাতায়। দুই লেখাতেই একই কথা: “১ নোয়ার পা = ৫৮ সেমি”।

“আর তোমারটা?” ও জিজ্ঞেস করল।

আমি জানতাম না। আমি নিজেকে মাপলাম। ফিতের ওপর একটা পা ফেললাম, স্বাভাবিক, স্কুলে যাওয়ার মতো, আর নোয়া নিচু হয়ে পড়ল, কারণ আমি ওপর থেকে পা না সরিয়ে পড়তে পারছিলাম না: একান্ন সেন্টিমিটার। ও ওটাও লিখল। আমি সারা জীবন পা পরে ঘুরেছি আর কখনও গুনিনি।

হুলিতা কাউন্টার থেকে আমাদের দেখছিল, হাত বুকে আড়াআড়ি, একটা ভুরু ওঠানো, যেন কেউ দুটো ঘড়ি একই সময় দিতে দেখছে।

আমি ভেবেছিলাম নোয়া আরেকটা হুলিতা হবে। ও তা নয়। নোয়া গোনে।



আমরা ইরেনের সঙ্গে উঠোনে গেলাম। হুলিতা আর নোয়া নিজেদের ধারণাটা পরীক্ষা করতে চাইছিল: ফটকের দুটো পাল্লাই খোলা।

প্রথম পাল্লাটা নিজে থেকে খোলে আর বন্ধ হয়: ওটা আমাদের চেনা। দ্বিতীয়টা খুলল না। দুজনেই টানল, প্রত্যেকে দুহাতে আর পা মাটিতে গেঁথে, হুলিতা লাল আর নোয়া জোরে তিন পর্যন্ত গুনছে, আর তিনে কিছুই হলো না। ইরেনে নিচু হয়ে দেখলেন। ওটায় রঙের ওপর রং, আর মাটিতে একটা স্ক্রু, যা ওটাকে গেঁথে রেখেছে, আঙুলের মতো মোটা।

"তাহলে লেবেলটাই ভুল," হুলিতা বলল।

"নিশ্চয়ই," নোয়া বলল।

ওরা দু সেকেন্ডে ঠিক করে ফেলল। আমি গুনলাম। দাগ দেওয়ার জন্য পেনসিল বের করলাম। এটা পঞ্চম।

আমি দিলাম না।

পেনসিলটা কাগজ থেকে এক আঙুল দূরে থেকে গেল। আমি পাতার কোণে দাগের সারিটা দেখলাম: চারটে, ভালো করে করা, সোজা, সবগুলো একই মাপের। ওগুলো আমি খুব যত্ন করে দিয়েছিলাম। আর একটা কম ছিল।

মঙ্গলবার, পাঁচিলের পেছনে, আমিও কাউকে না জিজ্ঞেস করে একটা জিনিস ঠিক করেছিলাম: চুপ থাকব।

আমাকে ছাড়া ঠিক করা-র নিচে, একই অক্ষরে আর পেনসিলে, আমি আরেকটা সারি লিখলাম: ওদের ছাড়া ঠিক করা। আর একটা দাগ। ওটা অন্যগুলোর চেয়ে বাঁকা হলো।



"লেবেল ভুল নয়," আমি বললাম। যতটা চেয়েছিলাম, তার চেয়ে জোরে বেরোল। "উঠোনের আরেকটা দরজা আছে। পেছনে, খালের গলিতে। ওটা পুরোনো, আর তালা দেওয়া। আমি ওটা মঙ্গলবার পেয়েছি।"

আমি পাতাগুলোর মাঝখান থেকে নকশাটা বের করলাম আর ভাঁজ করা ছোট থিয়েটারের ওপর খুললাম, যেটা মাটিতে ছিল আর টেবিলের কাজ করছিল। ভাঁজগুলো ওটাকে চারভাগে ভাগ করেছিল, ক্রস-আকারে, জানালার মতো।

“মঙ্গলবার?” হুলিতা বলল।

“মঙ্গলবার। আমি ওটা পরে ঠিক প্রমাণ করব বলে তুলে রেখেছিলাম।”

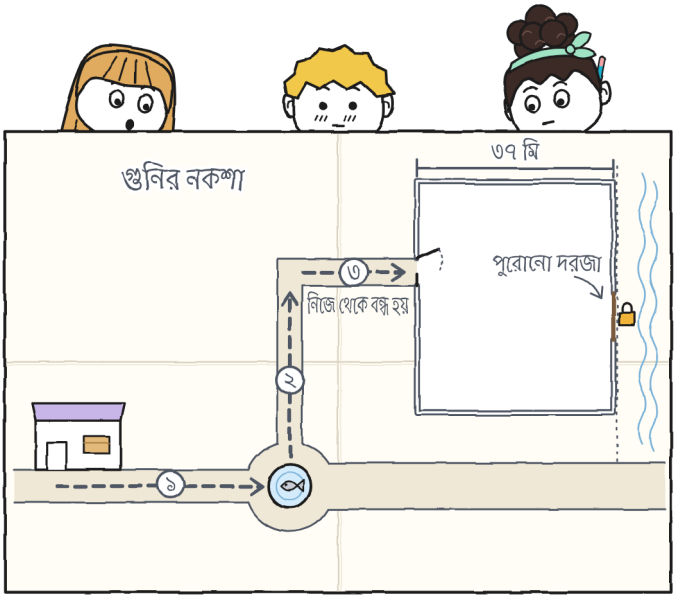

তিনটে মাথা কাগজের ওপর ঝুঁকল। পাঁচিল: সাঁইত্রিশ মিটার। ফটক, এক পাশে, ওর “নিজে থেকে বন্ধ হয়” সহ। আর উল্টো দিকে, দুই পাল্লার একটা দরজা, একটা তালা সামনে থেকে আঁকা, যাতে ভালো করে দেখা যায়: পুরোনো দরজা।

কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলল না। আমি মাপলাম: দীর্ঘ ছিল। পাঁচিলের ওপাশ থেকে দাবার আওয়াজ আসছিল, একটা ঘুঁটি একটা ছকে, মাঝে মাঝে, যেন একটা ঘড়ি, যার তাড়া নেই।

“ঠিক আছে,” নোয়া বলল। আর ও দরজাটা নিজের ম্যাপে টুকে নিল।

ও ফিরোজা পেনসিল দিয়ে টুকল, যত্ন করে, আমার নকশার ছোট ছোট ঘর পেনসিলের ডগায় গুনে ওটা নিজের জায়গায় বসাল। আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। নোয়ার কাছে, যে দরজা আছে, সেটা এমন দরজা, যা লিখে রাখতে হয়।

হুলিতা “ঠিক আছে” বলল না। ও একটা পা নাড়াচ্ছিল। ওর লাল জুতো উঠোনের মেঝের ওপর যাচ্ছিল আর আসছিল, ট্যাক, ট্যাক, ট্যাক, একটা ছন্দে, যেটা আমি চিনি: যে জিনিস তখনই বলা হবে না, তার।

“গতকাল এটা আমাদের খুব দরকার ছিল।”

“হ্যাঁ।”

গতকাল, নকশাটা খাতায় থাকা অবস্থায়, আমি আমার পা থেকে ফোয়ারা চার মিটার মেপেছিলাম, যখন নোয়া একটা থিয়েটারের ভেতরে।

উঠোনে কোনো কোণ নেই। আমি খুঁজলামও না। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকলাম, নকশা খোলা আর দুহাত ওর ওপর, যাতে হাওয়ায় উড়ে না যায়।

আমি “ঠিক আছে” বলিনি, কারণ তখনও ওটা সত্যি ছিল না। -হু.



আমরা তিনজন ওটা দেখতে গেলাম, ইরেনের সঙ্গে। ফটক দিয়ে বেরোলাম, যেটা পেছনে ক্লিক করে বন্ধ হলো, আর পাঁচিল ঘুরলাম। নোয়া ওটা গুনল, নিচু গলায়, ঠোঁট নেড়ে: চৌষট্টি পা। আমার কাছে আগেই ছিল: সাঁইত্রিশ মিটার। আমি মনে মনে করলাম, চৌষট্টি গুণ আটান্ন, আর দাঁড়াল সাঁইত্রিশের একটু বেশি। একই দাঁড়াল।

আমি যখন বললাম, নোয়া আমার দিকে তাকাল। কিছু বলল না, কিন্তু নিজের পায়ের সংখ্যার পাশে “৩৭ মি” লিখল, আর আমি আমার মিটারের পাশে “৬৪ পা” লিখলাম।

খালের গলিটা সরু আর স্থির জলের গন্ধ। শেষে রেলিং দেখা যায়, আর তার পেছনে খাল, যেটা না তাকিয়ে বয়ে যায়। পুরোনো দরজা কাঠের, দুই পাল্লার, একটা দৈত্যের বিছানার মতো চওড়া। নোয়া ওটা এক ধার থেকে আরেক ধার মাপল: তিন পা। আমি মাপলাম: এক মিটার পঁচাত্তর। প্রায় দুটো ফটক। কাঠ ধূসর, এত বৃষ্টি খেয়ে। তালায় তালার চেয়ে মরচে বেশি।

ভুলিতা ওটা এক আঙুলে ছুঁল, শুধু ডগা দিয়ে, যেভাবে ছোঁয় মানুষ এমন কিছু, যা কামড়াতে পারে।

"বছরের পর বছর বন্ধ," ইরেনে বললেন। "আমি সবসময় ওটাকে এমনই দেখেছি।"

ইরেনে সেন্টারের রেজিস্টারে খুঁজলেন, যেটা উনি ফাইলে রাখেন, পাতা ধরে ধরে, ভেজা বুড়ো আঙুলে উল্টে, একটা হলুদ পাতা পর্যন্ত।

"এই যে। যখন এই দরজা ব্যবহার হতো, উঠোনে ঢোকা যেত দুই জায়গা দিয়ে: ফটক দিয়ে, নয় এখান দিয়ে। ওরা বলত 'দুই দরজার উঠোন'। আর সব দলের মধ্যে, শুধু থিয়েটার উঠোনে মহড়া দেয়।"

পাতায় উঠোনের একটা পুরোনো নকশা ছিল, কালিতে, তার দুই দরজাসহ, আর একটা লেখা: দুই দরজার উঠোন। ওটা আমারটার মতো। বেশি পুরোনো আর খারাপ মাপা, কিন্তু একই রকম। আমি দরজা গুনলাম: দুটো। আমারটায়ও দুটো। এই প্রথম অন্য কারও নকশা আমাকে ঠিক বলল, আর ওটা এঁকেছে কেউ, আমি এই পাড়া কোথায় জানারও অনেক আগে।

"তাহলে লেবেলটা ধাঁধা নয়," নোয়া বলল।

"ওটা একটা ঠিকানা," আমি বললাম।

"উঠোনের ওয়ার্কশপ। দুই দরজা দিয়ে প্রবেশ।" ঠিকই লেখা ছিল। শুধু পুরোনো।

মারা পরে বলেছিলেন, উনি ওই তালা নয়বার দেখেছেন। ভেবেছিলেন বন্ধ দরজা আর গোনা যায় না। -হু.

চাবিটা ফাইলে ছিল, একটা খামে: “পুরোনো দরজা। হারিয়ো না।” ইরেনে ওটা দুই আঙুলে বের করলেন, এমনভাবে দেখলেন, যেভাবে দেখে মানুষ অনেকদিন না-দেখা কাউকে, আর তালা খুললেন। কষ্ট হলো। প্রথমে ঘুরল না; তারপর একবারে ঘুরে গেল। দরজাটা জাহাজের মতো আওয়াজ করল।

ভেতরে, উঠোনে, দাবার লোকেরা টেবিলগুলো রোদে এনে বসেছিল। কেউ মাথা তুলল না। বছরের পর বছর বন্ধ থাকা একটা দরজা ওদের পাশেই জাহাজের আওয়াজে খুলে গেল, আর দাবার লোকেরা মাথা তোলে না: এটাও খেলারই একটা ধরন।

ইরেনে মাঝখানে ছোট থিয়েটারটা খুললেন, দুই দরজার মাঝে কতটা জায়গা থাকে দেখতে। নোয়ার সঙ্গে খুললেন, দুজনের হাত পাশের দণ্ডে। ক্‌ল্‌যাক, ক্‌ল্‌যাক, ক্‌ল্‌যাক। জায়গা বেশিই থাকল।

ছোট থিয়েটারের জানালা দিয়ে দন আন্তনিওকে দেখা যাচ্ছিল, বেরেট টুপি চোখের ওপর, লাঠি হাঁটুর মাঝে, একটা ছকের সামনে। উনি একটা চাল ভাবছিলেন। একটু নাক ডাকছিলেন। আমি ওঁকে ফ্রেমের ভেতর কিছুক্ষণ রেখে দেখলাম, নড়তে চাইলাম না, পাছে ছবিটা বদলে যায়।

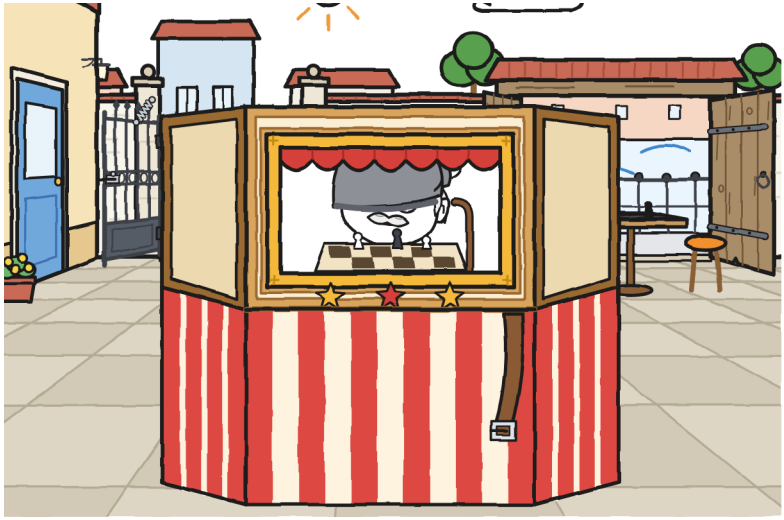

“শনিবার আমি দুটোই খুলব,” ইরেনে বললেন। “সাইকেল ঢুকবে পুরোনোটা দিয়ে, খালের গলি থেকে। পায়ে-বওয়া জিনিস, ফটক দিয়ে, ফুটপাত থেকে। তাহলে মুখোমুখি হবে না।”

“কিন্তু পুরোনোটা বেশি চওড়া,” হুলিতা বলল। “আর নিজে থেকে বন্ধ হয় না।”

“আর ফটকটা তোমাদের নিজের। ওয়ার্কশপ যদি ছোট থিয়েটারটা কোনো চত্বরে নিয়ে যায়, আরও খারাপ দরজা থাকবে।”

হুলিতা মুখ খুলল। মুখ খোলা থাকল একটু, কথাটা তৈরি, আর বলল না। ও নোয়ার দিকে তাকাল। আমার দিকে তাকাল।

“তুমি কী বলো?”

পুরো সপ্তাহে এই প্রথমবার। আমি তারিখ দিয়ে লিখে রাখলাম: “বৃহস্পতিবার ২৯। তুমি কী বলো?”। উত্তর দেওয়ার আগেই লিখলাম, যাতে ভাবতে ভাবতে প্রশ্নটা ভুলে না যাই।

আমি বললাম ফটকটা, তবে মহড়া দিয়ে। নোয়াও তা-ই বলল। হুলিতা বলল “ঠিক আছে”, আর এবার অর্ধেক সত্যি ছিল। আগের চেয়ে এক অর্ধেক বেশি।



তারপর আমরা মিটারটা ঠিক করলাম। ওটা রাখলাম ভাঁজ করা ছোট থিয়েটারের ওপর, যেটা এখন আমাদের চিরকালের টেবিল, যদিও মাত্র দুদিন ধরে। ওটায় তিনটে ঘর ছিল, আর কোনোটাই গতকালের জন্য কাজের ছিল না, আমারটার জন্যও না।

নতুন ঘরটা আমরা তিনজনে আঁকলাম। আমি চৌকো করলাম, পেনসিলে। হুলিতা নামটা লিখল, সবুজে। নোয়া ছোট ছবিটা আঁকল, ফিরোজায়: একটা মুখ, তার থেকে ছোট ছোট দাগ, রেডিও থেকে যেমন বেরোয়।

- জানানো: যা জানো, বলা।

বুধবারের সারিতে, নতুন ঘরে, হুলিতা লিখল: "কেউ না"। মঙ্গলবারেরটায়, আমি লিখলাম: "গুনি, না"। আস্তে লিখলাম, সবসময়ের অক্ষরে, বড়ও না, ছোটও না, আর মুছলাম না।

তিনজনের মিটারে চারটে ঘর। আমি অভিযোগ করছি না। চতুর্থটাই আমার সবচেয়ে কঠিন লাগে। -হু.



আমরা ফোয়ারা দিয়ে ফিরলাম। সন্ধ্যা হচ্ছিল, আর জল খাতার রঙ নিয়েছিল। আমি মাছটার সামনে দাঁড়ালাম, ওর খোঁড়া দিকে। বুধবারের মতোই পাখনাটা নেই, কিন্তু এখন আমি ওটা দেখতে জানতাম।

"তোমরা আমাকে গল্পটা বলবে?"

হুলিতা আর নোয়া একে অন্যের দিকে তাকাল। হাসল না। কিছু একটা উঁকি দিল, বুধবারের হাসির একটা কোণ, আর ওরা ওটা নিজের নিজের কাছে রেখে দিল।

"এটা লম্বা," হুলিতা বলল।

"শনিবার," নোয়া বলল। "যদি পৌঁছাই।"

এটা "না" ছিল না। আমি নকশাটা খাতায় রাখলাম, এবার ভাঁজ না করে, অর্ধেক নকশা বাইরে উঁকি দিয়ে।

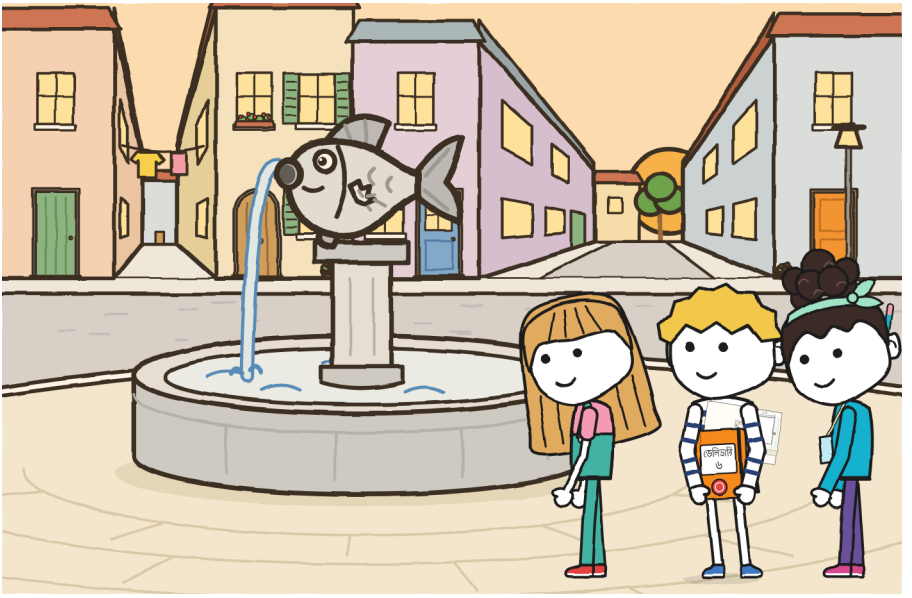
ডেলিভারি



অধ্যায় ৪

যে-কেউ কি দিক দেখাতে পারে?

শুক্রবার তোনিও দোকানে এল ঘড়ি, একটা পেনসিল আর একটা ক্লিপবোর্ডে ক্লিপ দিয়ে আটকানো বিজলির নাম-লেখানোর কাগজ নিয়ে। ওটা ও কাউন্টারে রেখে গেল, আমরা যাতে দেখি, যেমন রাখে মানুষ এমন একটা ট্রফি, যেটা এখনও জেতা হয়নি।

পাড়ার প্রতিযোগিতা · শনিবার ৩১। দল: বিজলি। তার নিচে, নম্বর দেওয়া তিনটে নাম: জোয়ে, তোনিও, ব্রুনো। সবগুলো একই সরু-সরু অক্ষরে, যেটা তোনিওর ছিল না। কোনো নাম কাটা নয়।

“জোয়ে লিখেছে,” ও বলল। “ব্রুনো বলেছিল: ‘ব্রুনো, ব দিয়ে’।”

“আর জোয়ে?”

“ও লিখেছে ব্রুনো। ব দিয়ে।”

আমি মিলিয়ে দেখলাম। ব-টা ছিল, আর খুব জোরালো, যে ব লেখা হয় যখন কেউ তোমার পেনসিলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর ও ওর বাক্সে বসল, “আপাতত”-এর বাক্সে, আর ঘড়ি শূন্যে নিয়ে গেল একটা ক্লিক দিয়ে, যেটা গোটা দোকানে শোনা গেল।

“আজ আমি সময় মাপছি। মত দিচ্ছি না। কী আবার করতে হলো, লিখে রাখছি।”

তোনিও বিজলির আর দোকানের দুটোই, আর সেদিন বিকেলে মনে হচ্ছিল ও ঠিক করে ফেলেছে কীভাবে দুটো একসঙ্গে হওয়া যায়: ক্লিপবোর্ডে, ওর দলের কাগজ; কবজিতে, আমাদের সময়।



তিনটে ধারণা ছিল, মাথা পিছু একটা। নোয়ারটা: পালা। তিনটে অংশ, আর প্রত্যেকটায় আলাদা একজন দিক দেখায়। আমারটা: দিক দেখানো আর পথ করে দেওয়া একই লোকের কাজ হোক, যে মুক্ত থাকে, কারণ যে দুজন বয় তারা শুধু ছোট থিয়েটার দেখে; আমি জানি, কারণ বুধবার আমি তাদের একজন ছিলাম আর যা দেখেছি, মূলত, রং-করা কাপড়। হুলিতারটা: এখনই শুরু করা।

আমি বললাম, আগে নকশায় পুরো পথটা দেখে নেওয়া উচিত।

“আমরা হাঁটতে হাঁটতে দেখব,” হুলিতা বলল।

ও জিতল। হাঁটতে হাঁটতে পথ দেখা হয় খুব তাড়াতাড়ি।

“প্রথমে কে দিক দেখাবে?” নোয়া জিজ্ঞেস করল।

আমরা তিনজন একসঙ্গে আঙুল দেখালাম। মঙ্গলবার আমরা এটা আগেও করেছিলাম, আর প্রত্যেকে আলাদা জায়গা দেখিয়েছিল: ফটক, ঘর, রাস্তা। এবার কেউ জায়গা দেখাল না। আমি নোয়াকে দেখালাম, নোয়া হুলিতাকে দেখাল আর হুলিতা আমাকে দেখাল। চক্রাকারে তিনটে হাত, যেন একটা চাকার স্পোক, যে ঘুরতে চায় না, আর মাঝখানে, মাটিতে, ভাঁজ করা ছোট থিয়েটার। কেউ নিজেকে দেখাল না।

তোনিও না তাকিয়েই লিখে নিল। ইরেনে দরজায় অপেক্ষা করছিলেন, ফাইল বুকে চেপে, উনিও মত না দিয়ে। সেই বিকেলে দোকানে দুজন মানুষ ছিলেন, যাঁরা মত

দিচ্ছিলেন না, আর তৃতীয়জন, মারা, যিনি কখনও জোরে মত দেন না, তাই পরিকল্পনাটা আমরা বৃত্ত ঘুরে বের করলাম:

১. দোকান → ফোয়ারা: দিক দেখায় হুলিতা।
২. ফোয়ারা → মোড়: দিক দেখায় গুনি।
৩. মোড় → উঠোন: দিক দেখায় নোয়া।



ছোট থিয়েটার তোলার আগে, হুলিতা বলল:

“একটা কথা।”

ও আগে থেকে জানায়নি। আমার সামনে দাঁড়াল; ছোট থিয়েটারের সামনে না, নোয়ার না, দরজার না: আমার সামনে, হাত শরীরের সঙ্গে সাঁটা, যেন ওগুলো বেঁধে রেখেছে যাতে পালিয়ে না যায়।

“বুধবার আমি এমন একটা নির্দেশ দিয়েছিলাম, যেটা শুধু নোয়া বুঝত, আর তারপর বলেছিলাম, তুমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছ।”

আর কিছু বলল না। দরকার ছিল না: সবই ছিল। কী হয়েছিল, কে করেছিল আর কার সঙ্গে। আমার একই কথার জন্য একটা পাতা লাগত, আর নিচে একটা তারকাচিহ্ন-দেওয়া টীকা।

আমি ওর পায়ের দিকে তাকালাম। হুলিতার পা তৈরিই চলে যাওয়ার জন্য; ও যখন কথা বলে, দুটোর একটা আগেই অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। এবার দুটোই স্থির, পাশাপাশি, টাইলের ওপর গাঁথা, যেন কেউ ওগুলো ব্রেক টেনে পার্ক করে রেখেছে। আমার পেছনে, নোয়া, তখনই নিজের হাতলে হাত, মাটির দিকে খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে ছিল, বিরক্ত না করার জন্য। তোনিওর পেনসিল কাগজ থেকে এক সেন্টিমিটার ওপরে থেমে ছিল।

“ঠিক আছে,” আমি বললাম।

এটা আমি নোয়ার কাছে শিখেছি, বৃহস্পতিবার। পুরোটা বেরোল।

আর যেহেতু আমি কিছু মেনে নিতে পারি না প্রশ্ন না করে, একটা করলাম:

“মাছটার কোন দিকের পাখনা নেই?”

“বাঁ দিকেরটা, যেদিক থেকে আসো,” হুলিতা উত্তর দিল, না ভেবে, যেন উত্তরটা মুখস্থ করে এসেছে। “ফোয়ারায়, বাঁয়ে বাঁক। আমি পাঁচ পা আগে জানাব।”

“এটা একটা নির্দেশ।”

এতে দিক ছিল, জায়গা ছিল আর আগাম খবর ছিল। আমি খাতায় ঠিক তেমনই লিখলাম, ওর “যেদিক থেকে আসো” সহ, বুধবারে ঠিক যেটার অভাব ছিল।

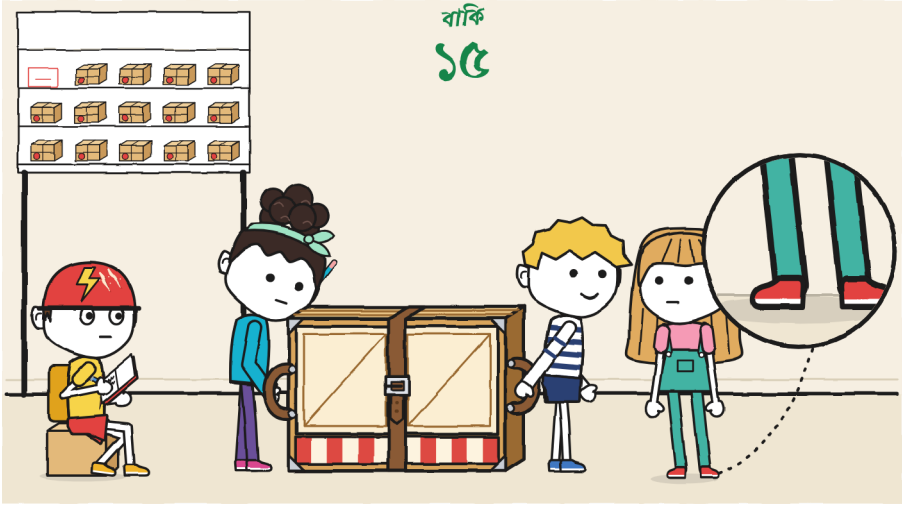

দুটো পা-ই স্থির। ছবিতে দেখে নাও। -হু.



প্রথম অংশ। নোয়া বেল্টটা দ্বিতীয় ফুটোয় আটকাল। আমি বললাম তৃতীয়টায় ভালো টেকে।

“তৃতীয়টায় খুলতে দেরি হয়,” নোয়া বলল। “আর পৌঁছে তাড়া থাকে।”

আমি একবার বললাম, জোরে, আর হেরে গেলাম। হাতল দুটোর ওজন একই ছিল।

আমরা বেরোলাম। ইরেনে, সবার শেষে, দশ পা দূরে, ফাইল নিয়ে; তোনিও, রাস্তা দিয়ে, সাইকেল হাতে আর চোখ কবজিতে। হুলিতা তিন পা সামনে, আর ছোট চত্বরে ঢোকার মুখে বাঁ দিকে একটা হাত তুলল।

“পাঁচ পা... বাঁয়ে বাঁক!”

“বেল্ট!” নোয়া বলল। আর ধরল।

আমরা খোঁড়া মাছকে ঘুরলাম, যেন বরাবর এভাবেই করে এসেছি। আমার দিক থেকে মাছটার তখনও সব পাখনাই ছিল; ওকে বিশ্বাস না করা আমি শিখে নিয়েছিলাম। একটাও ক্ল্যাক নয়।

“প্রথম অংশ: ছয় মিনিট,” তোনিও বলল। “আবার করা: কিছু না।”



ফোয়ারায় আমরা বদলালাম। হুলিতা আর নোয়া, হাতলে; আমি, মুক্ত। আমার জীবনে প্রথমবার আমি পেনসিল ছাড়া অন্য কিছুকে পরিচালনা করছিলাম।

আমি তৈরি হয়ে এসেছিলাম। আগের রাতে, টেবিল-ল্যাম্পের নিচে, আমি নকশায় সরু রাস্তাটা মেপেছিলাম: দুটো ফুটপাতের ধাপ, একটা বেরিয়ে থাকা সদর দরজা, নাচতে থাকা একটা ম্যানহোলের ঢাকনা আর একটা জেব্রা-ক্রসিং। ছোট রাস্তাটা, ওদেরটা, ক্রসিংয়ের দাগ নেই এমন জায়গা দিয়ে কোনাকুনি পেরোয়। আমারটা ধাপ থেকে নামে, দাগ ধরে পেরোয় আর আবার ওঠে: নয় পা বেশি আর দুটো “থামো”, যেগুলো অন্যটায় নেই। আমি সবকিছুতে নম্বর দিয়েছিলাম। কিন্তু নকশায় মহিলারা থাকে না।

আমি এভাবে দিক দেখাই:

“তিন পা। থামো। ফুটপাতের ধাপ। ওঠো। দুই পা। থামো। একজন মহিলা।”

মহিলা সামনে থেকে আসছিলেন একটা বাজারের ট্রলি নিয়ে।

“শুভ সন্ধ্যা।”

উনি উত্তর দিলেন। আমি হাত নামালাম না।

“মহিলা যাচ্ছেন। চার পা।”

আমি পাশ ফিরে হাঁটছিলাম, কাঁকড়া আর ট্রাফিক পুলিশের মতো, এক হাত ওপরে। ওপরে তোলা এক হাত ট্রাফিক পুলিশের একমাত্র জিনিস, আর বাসগুলো ওর কথা শোনে। “থামো” আমি বুধবার ইরেনের কাছে শুনেছিলাম: উনি কোন দিক দিয়ে বলেন না; ধাপ এলে “থামো” বলেন। তখন আমার কম মনে হয়েছিল। যে দিক দেখায়, তার জায়গা থেকে মনে হয় অনেক: এটাই একমাত্র শব্দ, যেটা একসঙ্গে দুজন মানুষকে, একটা থিয়েটারকে আর, দরকার হলে, একজন মহিলাকে থামায়।

“থামো। ঢাকনা। ওটা কিনারা দিয়ে পেরোব, মাঝখান দিয়ে নয়। দুই পা।”

হুলিতা সামনে ছিল, ওর হাতলে, রা না কেড়ে। হুলিতার ক্ষেত্রের এটা একটা খবর। ওর পা নিজে থেকেই ছোট রাস্তার দিকে চলে যাচ্ছিল: কোনাকুনি বেরোচ্ছিল, যেভাবে চেনা বাড়ির ঘণ্টির দিকে হাত যায়, এক মুহূর্ত হাওয়ায় থেকে যাচ্ছিল আর আমার লাইনে ফিরে আসছিল। ওটাকে ও আমারটায় ফিরিয়ে আনছিল। আমি ওকে এটা চারবার করতে দেখলাম। চতুর্থবার ও ঠোঁট চেপে ধরল, আর মোড় পর্যন্ত আর ছাড়ল না।

নোয়া, পেছনে, ঠোঁট নাড়ছিল। আমি ভাবলাম ও পা গুনছে, যেটা ও সবসময় করে। রাস্তায়, তোনিও ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল তারপর আমার দিকে, তারপর ঘড়ির দিকে, যেন কেউ এমন দুটো জিনিস মেলাচ্ছে, যারা একমত হচ্ছে না।

“থামো। মোড়।”

পৌঁছালাম। কাউকে পিছিয়ে যেতে হয়নি।

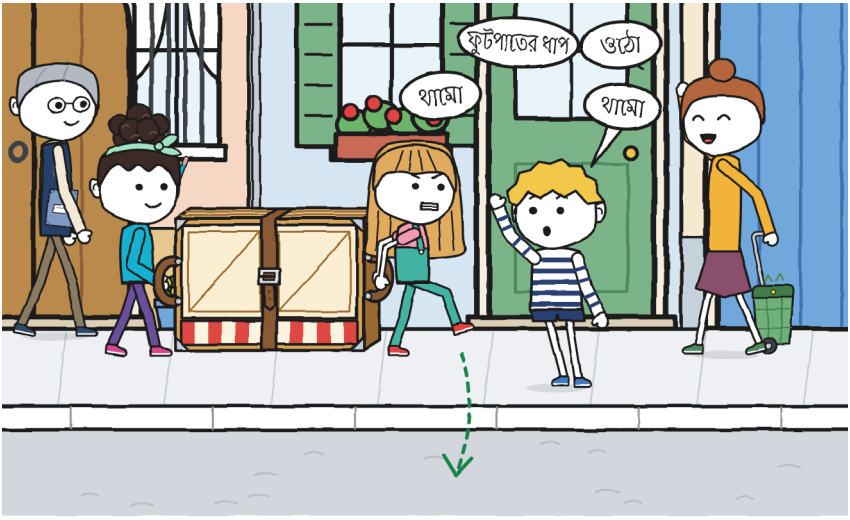

“দ্বিতীয় অংশ: এগারো মিনিট,” তোনিও বলল। “আমার জীবনে মাপা সবচেয়ে ধীর। আবার করা: কিছু না।”

এগারো মিনিট অনেক মিনিট। আমি পরোয়া করলাম না। মিনিটগুলো লিখল তোনিও; অন্যটা লিখলাম আমি, ছোট অক্ষরে, যাতে ক্ষয়ে না যায়: প্রথমবার আমি কিছু পরিচালনা করেছি আর সেটা আবার করতে হয়নি।

“তুমি ‘থামো’ বলেছ চোদ্দবার,” হুলিতা বলল।

“আমি গুনেছি,” নোয়া বলল। “পনেরো।”

তাহলে ও পা গুনছিল না।

“ছয়টা বাড়তি ছিল,” হুলিতা বলল। “কিন্তু আমি সবগুলোই করেছি।”

“একটাও বাড়তি ছিল না,” আমি বললাম।

“ছয়।”

কে ঠিক, তোনিও তা লিখল না। সংখ্যাটা লিখল: "'থামো': ১৫ (গোনে নোয়া)"। হুলিতা মার্কারের ঢাকনা খুলে পাশে সবুজ কালিতে একটা শামুক আঁকল, বিজলির হেলমেট পরা। তোনিও ওটা কিছুক্ষণ দেখল। মুছল না। তোনিওর কাগজে কিছু মোছা হয় না।

আমি একটাও তর্ক করিনি। দাঁত চেপে চেপে আমার ব্যথা করছিল। -হু.



তৃতীয় অংশ, মোড় থেকে উঠোন। বইছিলাম হুলিতা আর আমি; দিক দেখাচ্ছিল নোয়া, প্রতিযোগিতার ম্যাপ নিয়ে, যেটা ইরেনে সব দলকে দিয়েছিলেন।

কুড়ি পা পরে ও থেমে গেল, যেখানে খালের গলি শুরু।

"মিলছে না।"

"কী মিলছে না?"

"ম্যাপ আমাদের এখান দিয়ে ঢোকাচ্ছে। পুরোনো দরজা পর্যন্ত। আর আমরা ঢুকি ফটক দিয়ে, যেটা উল্টো দিকে।"

হুলিতা ম্যাপটা দেখতে ওর দিকে ঘুরতে শুরু করল, পুরো ছোট থিয়েটার বাঁকের পেছনে আর বেল্টে কেউ নেই।

"মাটিতে," আমি বললাম।

"এক সেকেন্ড দেখে নিয়েই চলব।"

"আগে নামানো। তারপর তর্ক।"

হুলিতা বেল্টের দিকে তাকাল, আমার দিকে তাকাল, আর ওর দিকটা নামাল। আমি আমারটা নামালাম। ছোট থিয়েটারটা ফুটপাতে থেকে গেল, চ্যাপ্টা আর বাধ্য, যেটা ওর সবচেয়ে ভালো অবস্থা।

আমি আমার নকশা ওর ম্যাপের পাশে রাখলাম, ছোট থিয়েটারের ওপর, যেটা আবার আমাদের টেবিল হয়েছিল। বৃহস্পতিবার থেকে আমি ওটা ভাঁজ না করে রাখি, আর বোঝা যায়: অর্ধেক খাতা নিয়ে নেয় আর ওপরে জিভের মতো বেরিয়ে থাকে। প্রতিযোগিতার ম্যাপে একটাই প্রবেশ আঁকা ছিল, লাল তির দিয়ে, আর ওটা ফটক ছিল না: ছিল পুরোনো দরজা। তালাওয়ালা। যেটা মঙ্গলবার আমি একাই পেয়েছিলাম আর দুদিন চুপ ছিলাম।

“এটা একটা পুরোনো ম্যাপ,” আমি বললাম। “যখন ওখান দিয়ে ঢোকা হতো।”

নোয়া নিজেরটায় একটা আঙুল রাখল, আমি আমারটায়। একই জায়গা, দুটো কাগজে।

ওখান থেকে ফটক পর্যন্ত নোয়ার বিয়াল্লিশ পা। বা আমার চব্বিশ মিটার। ওর পা আর আমার ফিতে দিয়ে পুরো পাড়াটা মাপা যায়।

“ইরেনেকে বলব?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

ইরেনে দশ পা দূরে ছিলেন, ফাইল নিয়ে। সবই শুনেছিলেন, আমি নিশ্চিত, আর অপেক্ষা করছিলেন আমরা ওঁকে বলি, যেভাবে অপেক্ষা করে মানুষ কেউ বাক্য শেষ করার জন্য।

“আর অন্য দলগুলোকেও,” নোয়া বলল। “নইলে যারা হেঁটে আসবে, সবাই গলিতে ঢুকে যাবে। সাইকেল নিয়ে।”

আমি শনিবারের গলিটা কল্পনা করলাম: পাঁচটা দল, প্রত্যেকের নিজের বোঝা, আর বিজলির তিনটে সাইকেল একটা দরজার সামনে ঘণ্টি বাজাচ্ছে।

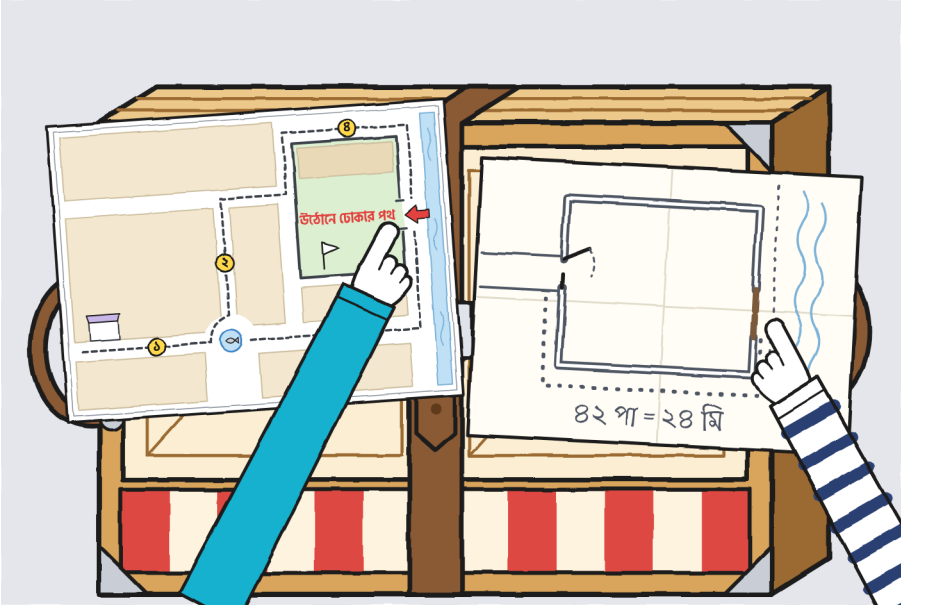

আমি কিছু বললাম না। আমি একমত ছিলাম। একমত হলে দাগ পড়ে না।

ইরেনে উঠোনের একটা বেঞ্চে বসে সব ম্যাপ হাঁটুতে নিয়ে একে একে লাল মার্কার দিয়ে ঠিক করলেন: পুরোনো তিরটা কেটে দুটো আঁকলেন, একটা পুরোনো দরজায় একটা সাইকেল নিয়ে, আরেকটা ফটকে একটা বোঝা নিয়ে। তোনিও নিজেরটা আমার নকশার সঙ্গে মেলাল, লাইন ধরে ধরে।

“বিজলি ম্যাপে যেখান দিয়ে বলছে, সেখান দিয়েই ঢুকত।”

“তোমরা ঢুকবে ওখান দিয়েই,” ইরেনে বললেন। “সাইকেলের জন্য ম্যাপটা ঠিকই ছিল। কাকতালীয়ভাবে।”

তোনিও নিজের ম্যাপের দিকে তাকিয়ে রইল, সেই লোকের মুখ নিয়ে, যে জানল সে ঠিক ছিল, ঠিক হওয়ার জন্য কিছু না করেই, যেটা বিজলিতে নম্বর পায় না।

আমরা মোড়ে ফিরলাম আর তৃতীয় অংশটা আবার করলাম, এবার ফটক পর্যন্ত। হুলিতা আর আমি বইছিলাম, আর নোয়া দিক দেখাল, পথ করে দিল আর জানাল, সব একসঙ্গে:

“থামো! আমি পাল্লাটা ধরছি! যাও!”

আমরা পেরোলাম। আমি মিটারটা ভরলাম। “মোড় → উঠোন” সারিতে লিখলাম: গুনি আর হুলিতা, নোয়া, নোয়া, আর চতুর্থ ঘরে, “নোয়া: ‘ম্যাপটা ভুল’”। প্রত্যেক নাম নিজের রঙে: পেনসিল, সবুজ আর ফিরোজা।

এটা ছিল প্রথম সারি, যার সব ঘর ভরা। জানানোর ঘরটা আমরা বৃহস্পতিবার আমার জন্য বানিয়েছিলাম, আর ওটার উদ্বোধন করল নোয়া। আমি ওর নাম লিখলাম আমার সবচেয়ে পরিষ্কার অক্ষরে।

ও ওটা পিঠ দিয়ে ধরেছিল, যেমন তুমি মঙ্গলবার। ওটা আমি লিখে রাখছি। –হু.

তোনিও আমাদের ওর কাগজ দেখাল। ওপরে বড় অক্ষরে লেখা, কী আবার করতে হয়েছে:

- বুধবার: ফোয়ারার বাঁক, ৩ বার।
- শুক্রবার, অংশ ১: কিছু না।
- অংশ ২: কিছু না (ধীর)।
- অংশ ৩: প্রবেশ। দলের দোষ ছিল না: ম্যাপের।

আর নিচে, দুবার আন্ডারলাইন করা: “যা বারবার করতে হয়, তা পা নয়। নির্দেশ।”

“এই শেষটা একটা মত,” হুলিতা বলল।

“এটা একটা তথ্য,” তোনিও বলল। “বিজলিতে, ভুল বলা একটা দিক দুবার দাম দেয়: যাওয়ার সময় আর ফেরার সময়।”

ও হেলমেট পরে নিজের মহড়া দিতে চলে গেল। প্রথম মোড়ে, টিং-টিং।

রাতে, দোকানে, মারা ছোট থিয়েটারটা ওর বাক্সে রাখলেন, আর বাক্স আবার হয়ে গেল সবগুলোর মতো একটা বাক্স। ঢাকনা নামার আগে, নোয়া বকলসটা দেখল।

“কাল, তৃতীয় ফুটোয়। দেরিতে খুললেও।”

ও বলল বকলসের দিকে তাকিয়ে, আমার দিকে না। এটা আমিই বেরোনোর আগে বলেছিলাম। আমি ওটা “জেতা”-তে লিখলাম না: ওটা ও ঠিক করেছে, নিজের সময়ে, আর সেটা অন্য কলামে যায়।

আমি খাতাটা দাগের কোণে খুললাম: আমাকে ছাড়া ঠিক করা-র চারটে আর তার নিচে, আমারটা। আজ আমি কোনোটা দিইনি। আমি দিনটা পেনসিল হাওয়ায় ধরে মিলিয়ে নিলাম, যেভাবে হিসেব মেলানো হয় ঠিক বলে ধরার আগে। আমি চারটে মতভেদ গুনলাম। চারটেই আমি জোরে বলেছি। একটা জিতেছি।

শুক্রবার। মতভেদ: ৪। বলা: ৪। জেতা: ১।

ওর তাকে, ৬ নম্বরের বাক্সে তখনও নয়টা সিলমোহর। নয়টা। একটাও বেশি না।

যেটা তুমি জিতেছ, সেটা হলো তর্কের আগে ছোট থিয়েটারটা মাটিতে নামানো। ওটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম। -হু.

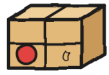

অধ্যায় ৫

প্রথম হয়ে পৌঁছানো কি জরুরি?

শনিবার আমি শনিবারের কমলা টি-শার্টটা পরলাম। এটা কুসংস্কার নয়: শনিবারে নানা কিছু ঘটে, আর আমি সবাইকে একই পোশাকে দেখতে চাই, যাতে তুলনা করা যায়।

"তুমি খাতার সঙ্গে ম্যাচ করেছ," হুলিতা বলল।

আমি খাতাটা টি-শার্টের গায়ে ধরে দেখলাম। ও ঠিক বলেছে, এক পোঁচ রঙের তফাতে।

এগারোটায় উঠোনের দুটো দরজাই খোলা, অনেক বছরের মধ্যে প্রথমবার, আর দুটো দিয়েই লোক ঢুকছিল: সাইকেল, পুরোনোটা দিয়ে, খালের গলি থেকে; পায়ে-হাঁটারা, ফটক দিয়ে, ফুটপাত থেকে। পুরোনো দরজা, হাট করে খোলা, সবার চেয়ে বেশি অবাক দেখাচ্ছিল। পাঁচিল থেকে পাঁচিল ছোট পতাকা আর একটা টেবিলে একটা সাইন, যাতে লেখা শেষ-রেখা। ফ্লোরা সামনের সারিতে বসেছিলেন ওঁর ফ্লাস্ক নিয়ে, যেন কেউ শোভাযাত্রা দেখতে এসেছেন আর আতশবাজি পর্যন্ত থাকবেন ভেবেছেন। জুতোর দোকানের মালকিন, দাঁড়িয়ে, হাত আড়াআড়ি। ভেরা, কোলে টুকরো; টুকরো, মাথা ঘুরিয়ে যা কিছু নড়ছিল তার দিকে, আর সেদিন সকালে সবই নড়ছিল। পাঁচিলের মাথায়, একটা ম্যাগপাই। ওকে কেউ নিমন্ত্রণ করেনি।

ইরেনে একটা বেঞ্চে উঠে হুইসেল বাজালেন। স্কুলের উঠোনের নীরবতা নামল, যেটা নিচে অনেক আওয়াজওয়ালা নীরবতা।

“প্রত্যেক দল নিজের বোঝা এখানে নিয়ে আসবে, সবগুলো স্টেশন ঘুরে। বোঝা নিয়ে ছোটা যায় না। যে ছুটবে, সে অংশটা আবার করবে। আর সময় জেতে যে আবার করে না।”

আমি কথায় কথায় লিখে নিলাম। এই প্রথম কোনো খেলার নিয়ম মনে হলো আমার জন্যই লেখা।



তালিকায় পাঁচটা দল ছিল, একটা কর্কবোর্ডে পিন দিয়ে আটকানো:

১. বিজলি (জোয়ে, তোনিও, ব্রুনো)
২. কোরাস
৩. কিস্তি
৪. সূঁচেরা
৫. নোয়া + ২

বিজলি নিয়েছিল একটা খাম, সাইকেলে। কোরাস, একটা স্ট্যান্ড। দাবা, একটা বিশাল ছক। সেলাই, একটা মাথাহীন ম্যানিকুইন। আমাদেরটা নোয়া লিখে রেখেছিল সোমবার, আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে।

“আমরা ‘নোয়া + ২’,” আমি হুলিতাকে বললাম।

“আমি ২,” ও বলল। “তুমি হবে প্লাস।”

আমি নাম আর সংখ্যার মাঝের ছোট ক্রসটার দিকে তাকালাম। ওটা কখনও চিহ্ন ছিল না। আমি ওটা একটা পদের মতো লিখে রাখলাম।

প্রতিটা দল বেরোত যে দরজায় তার বোঝা ঘুমোয় সেখান থেকে। আমাদের রওনা করালেন দন আন্তনিও, যিনি কাছেই থাকেন আর ছোটেন না।

দোকানের দরজায়, মারা বাক্স থেকে ছোট থিয়েটারটা বের করলেন, আর ছোট থিয়েটার বেড়ে ওর রাস্তার মাপে এল। নোয়া তাড়াতাড়ি বেল্ট আটকাল আর আমরা ওটা তুললাম।

ক্ল্যাক। একটা প্যানেল এক বিঘত খুলে গেল, যেন কোনো মুখ, যার কিছু মনে পড়েছে।

"মাটিতে," আমি বললাম।

কেউ তর্ক করল না। আমরা তিনজন একসঙ্গে ওটা নামালাম, আস্তে, যেন ভেতরে একটা ডিম। দ্বিতীয়বার, নোয়া তাড়াহুড়ো না করে বেল্ট আটকাল, তৃতীয় ফুটোয়, আর পরীক্ষা করতে দুবার টানল। আমি বকলস দেখলাম, তারপর রাস্তা। দুটোই ঠিক ছিল।

দন আন্তনিও নিজের বেরেট টুপি খুলে হঠাৎ নামালেন, ওটা পতাকার কাজ করল।

"শান্তভাবে," উনি বললেন, "এভাবেই পৌঁছানো যায়।"

মারা শেষে এলেন, খালি বাক্স বগলে। ভেতরে কিছু না থাকলে ওটাকে আরও বড় দেখাচ্ছিল।



প্রথম অংশ। দিক দেখাচ্ছিল হুলিতা।

"পাঁচ পা... বাঁয়ে বাঁক!"

"বেল্ট!"

আমরা আস্তে আস্তে খোঁড়া মাছ ঘুরছিলাম, পুরো মোড়টা জুড়ে, যখন জোয়ে সাইকেলে এল। ও সবার প্রথম। ব্রেক করল আর এক পা মাটিতে রাখল।

"তোমরা যাও। এটা নিয়ে ছোটা যায় না।"

আমরা বাঁক পেরোনো পর্যন্ত ও অপেক্ষা করল। তারপর চলে গেল। আমরা কুড়ি সেকেন্ড ওকে ছাড়িয়ে ছিলাম। ও নিজেই সময় মাপল।

জোয়ে হঠাৎ ব্রেক করল। বিনুনিটা একটু দেরিতে থামল। -হু.

প্রতিটা স্টেশনে একটা কার্ডে সিল দেওয়া হতো। বেকারির স্টেশনে ছিলেন এলিয়া, যিনি ময়দা-মাখা বুড়ো আঙুল দিয়ে সিল দিতেন আর এমনভাবে চাপতেন, যেন কার্ডটা ময়দার ডেলা আর ওটাকে বিশ্রাম দিতে হবে। আমাদেরটায় তিনটে সাদা ছাপ রেখে গেলেন, মাথা পিছু একটা, যদিও আমরা পৌঁছেছিলাম তখন, যখন বিজলির কার্ডে ময়দা শুকিয়ে গেছে।

বিজলি আমাদের সামনে দিয়ে তিনবার গেল, প্রতিবার আলাদা রাস্তায়। ছোট থিয়েটারের পেছন থেকে বিজলিকে দেখাচ্ছিল একটা কুকু ঘড়ির মতো: বেরোয়, বাজে আর ঢুকে যায়। তোনিও দুহাত হ্যান্ডেলে রেখে মোড়ে মোড়ে ঘণ্টি বাজাচ্ছিল। ব্রুনো খামটা নিয়েছিল। জোয়ে সামনে, আর প্রতি স্টেশনে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল, তিনজন না হওয়া পর্যন্ত কার্ড না ছুঁয়ে। দ্বিতীয়বার যখন ওরা গেল, তোনিও ঘড়ি দেখল না: আমাদের দেখল। সারাদিনে ওকে মত দিতে যতটা দেখেছি, এটাই তার সবচেয়ে কাছাকাছি।



দ্বিতীয় অংশে বইছিল হুলিতা আর নোয়া, আর দিক দেখাচ্ছিলাম আমি। আমাদের ছাড়িয়ে গেল কোরাস, ওদের স্ট্যান্ড নিয়ে। ছুটতে ছুটতে। ইরেনের হুইসেল বাজল, যিনি একসঙ্গে সব জায়গায় ছিলেন, আর কোরাস ফোয়ারায় ফিরে গেল নিচু গলায় গান গাইতে গাইতে, যেভাবে গায় মানুষ যখন একটা অংশ আবার করতে হয়।

আমাদের ছাড়িয়ে গেল দাবা, ছকটা কাত করে আর ঘুঁটিগুলো একটা থলেতে, যেটা শিলাবৃষ্টির মতো শব্দ করছিল। ছাড়িয়ে গেল ম্যানিকুইন পর্যন্ত, শোয়ানো, সেলাইয়ের তিনজন বয়ে নিয়ে, যারা পায়ের আঙুলে হাঁটছিল, যেন ম্যানিকুইনটা ঘুমোচ্ছে। একটা মাথাহীন ম্যানিকুইন তোমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এমন অভিজ্ঞতা আমি মাপতে জানি না, আর চেষ্টা করেছি।

হুলিতা ছুটল না। মানে: ওর একটা পা ছুটে গিয়েছিল। ও ওটাকে ফিরিয়ে আনল।

“প্রথম হয়ে পৌঁছানো কি জরুরি?” ও জিজ্ঞেস করল।

“লেবেলে ‘প্রথম’ লেখা নেই,” নোয়া বলল। “লেখা ‘ভাঁজ করা’।”

“ফুটপাতের ধাপ,” আমি বললাম।

আমরা ওটা পেরোলাম।

কোরাস অংশটা গান গেয়ে আবার করল। ফেরার সময় সুর আরও ভালো লাগছিল। -হু.



তৃতীয় অংশ। নোয়া ফটক পর্যন্ত দিক দেখাল। সেখানে আমরা ছোট থিয়েটারটা মাটিতে নামালাম।

“কে খুলবে?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল। আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল।

আমরা তিনজন একসঙ্গে আঙুল দেখালাম। সপ্তাহে এটা তৃতীয়বার। মঙ্গলবার, প্রত্যেকে আলাদা জায়গা দেখিয়েছিল। শুক্রবার, প্রত্যেকে অন্য একজনকে। এবার, তিনজনেই, একই জায়গায়: নোয়া ফটক দেখাল, হুলিতা ফটক দেখাল আর আমি ফটক দেখালাম। তারপর আমরা হাসলাম, কারণ এভাবে ঠিক হয় না কে। একটা দরজার দিকে তাক-করা তিনটে হাত দরজা নিয়ে একটা খুব দৃঢ় মত, আর আমাদের নিয়ে কোনোটাই নয়।

“তুমি,” আমি আর নোয়া বললাম।

নোয়া ওর হাতলে গেল। হুলিতা পাল্লাটা পিঠ আর দুহাত দিয়ে ধরল, পা শক্ত করে গেঁথে, আর একবারের জন্য ওর কোনো পা ছুটল না।

“থামো! আমি পাল্লাটা ধরছি! যাও!”

আমরা পেরোলাম। ভাঁজ করা। আস্ত।

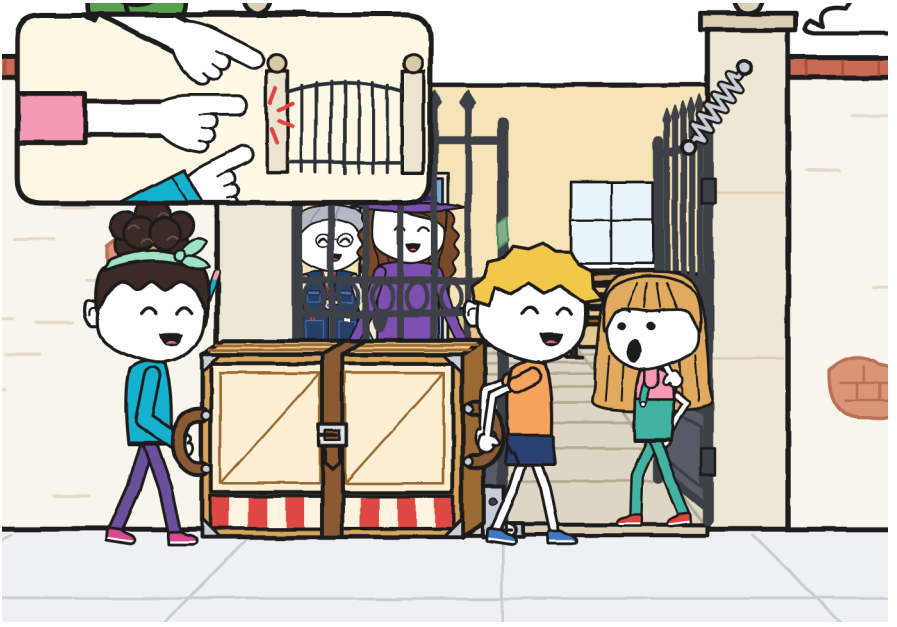

“একচল্লিশ মিনিট,” ইরেনে বললেন।

বিজলি লেগেছিল চোদ্দ। ওরা তিনজন মাটিতে বসে ছিল, সাইকেলের পাশে, ঘাম ছাড়া। জোয়ে আমাকে দুই আঙুল দিয়ে অভিবাদন জানাল; ব্রুনো, পুরো হাত দিয়ে।

মারা এলেন বাক্স বগলে। ইরেনে নিজের উঠোনের মেঝেতে ছোট থিয়েটারটা দেখলেন, ভাঁজ করা, বেল্ট জায়গায়, আর অনেকক্ষণ দেখলেন, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত, যেভাবে দেখে মানুষ কেউ দীর্ঘ যাত্রা থেকে ফিরলে, আস্ত এসেছে কি না দেখতে। ফাইল খুলে মারাকে রেজিস্টারের কাগজটা দেখালেন: “থিয়েটার ওয়ার্কশপ। দায়িত্বে: ইরেনে”। মারা ওটা পড়লেন যেভাবে ওঁর পড়ার নিয়ম, আঙুল দিয়ে, আগে লাইনটা আর তারপর সিল। হুলিতা ওঁকে সবুজ মার্কার দিল, যেটা মোছে না।

“আমার কাজে লাগবে,” ইরেনে বললেন। আর লেবেলে সই করলেন।

লেবেলে পৌঁছে গেছে কথাটা ফুটে উঠল। কেউ ওটা লেখেনি। চারপাশে তখনও ফেরত-এর নয়টা সিলমোহর, মারার প্রতিটা যাত্রার একটা করে, আর মাঝখানে, এখন, একটা সবুজ সই, যে কোথাও যেতে চায় না।



ইরেনে সেন্টারের ইনভেন্টরি খুললেন ছোট থিয়েটারটা লিখে রাখতে। দরকার হলো না: ওর পাতা তৈরিই ছিল। ওপরে লেখা ভাঁজ-করা ছোট থিয়েটার · পাওয়া মুলতুবি, আর নিচে, পরীক্ষা লেখা একটা ঘরে, একটা পুরোনো লাইন, বাঁকা, খুব খারাপ হাতের লেখায়:

“উঠোনে পরীক্ষা করা হয়েছে। ভাঁজ করা অবস্থায় দুই দরজা দিয়েই যায়। খোলা অবস্থায় যায় না। —র.”

আমরা তিনজন ওটা পড়তে ঝুঁকলাম, এত ঝুঁকে যে মাথাগুলো ওর ওপর ছায়া ফেলল।

“আমি ওয়ার্কশপ চালানোর আগেকার,” ইরেনে বললেন। “জানি না কে।”

“আমরাও না,” হুলিতা বলল। “কিন্তু আমরা একটু একটু জেনে যাচ্ছি।”

র. ওই উঠোনে ছিলেন আর পাঠানোর আগে ছোট থিয়েটারটা পরীক্ষা করেছিলেন। এবার দুটো দরজাই মেপেছিলেন: ফটক আর পুরোনোটা। র. যা জানতেন, তা এক লাইনে এঁটে যায়। আমাদের লেগেছিল এক সপ্তাহ।

এলিয়ার দরজা। উঠোনের দুটো। দরজা মাপেন। এটা আমি কার্ডের জন্য রেখে দিচ্ছি। -হু.



জিতল বিজলি, একটাও অংশ আবার না করে। পুরস্কার ছিল এলিয়ার একটা বড় রুটি, ওপরে ময়দার একটা ১। জোয়ে ওটা তিন টুকরো করল। ব্রুনোর টুকরোটা ওরটার মতোই বড়; আমি চোখে মাপলাম, আর টুকরোর বেলায় আমার চোখ ভুল করে না।

যে দলগুলো আস্ত বোঝা নিয়ে পৌঁছাল, ইরেনে তাদের একটা ফিতে দিলেন। আমাদেরটা আমি কাছ থেকে দেখলাম, কারণ আমরা তিনজনই ওটা ধরেছিলাম: একটা হাত পেনসিল নিয়ে, একটা সবুজ মার্কার নিয়ে আর একটা ফিরোজা হাতা নিয়ে। ওটা সোনালি সাটিনের, ঝিলিক, যেগুলো কাছে নিশ্বাস ফেললে জায়গা বদলায়, ওপরে একটা ছোট গিঁট আর একটা কিনারা, যেখান থেকে ইতিমধ্যেই একটা সুতো বেরোচ্ছিল। দূর থেকেও পড়া যেত এমন অক্ষরে লেখা: ফাইনালিস্ট · পাড়ার প্রতিযোগিতা।

পাঁচিলে, ম্যাগপাইটা মাথা কাত করল। যে নকশা আমি বুঝি না, তার সামনে আমি যেটা করি।

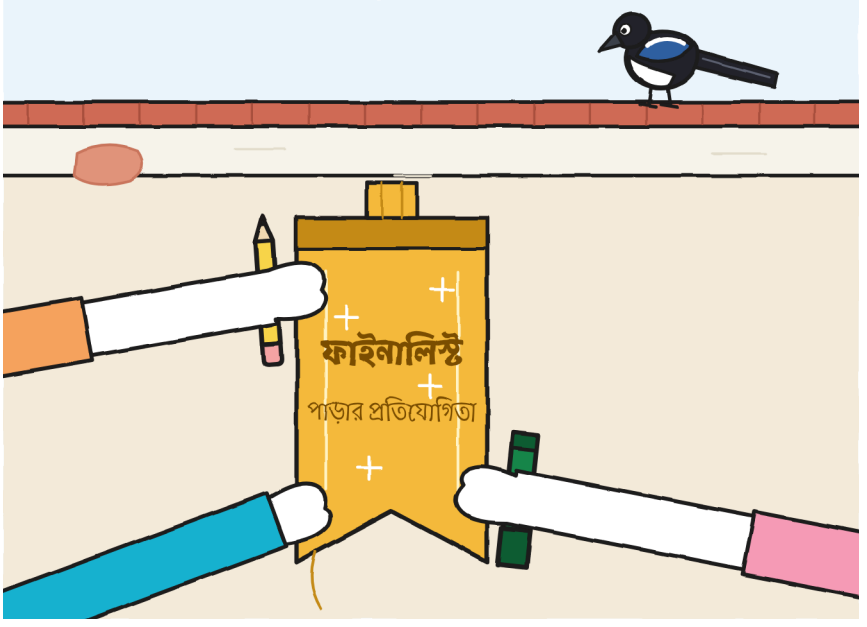

“ফাইনালিস্ট মানে যে সবার শেষে,” হুলিতা বলল।

“মানে যে শেষ পর্যন্ত আসে,” নোয়া বলল।

“আমরা সবার শেষে এসেছি, শেষ পর্যন্ত,” আমি বললাম। “দুটোই ঠিক।”



“যেহেতু এটা এখানে,” ইরেনে বললেন, “এটার উদ্বোধন করতে হবে।”

ওরা ওটা খুলল, মারা আর উনি, হাত পাশের দণ্ডে। ক্ল্যাক, ক্ল্যাক, ক্ল্যাক। সপ্তাহে এই প্রথম আমি ওটাকে ইচ্ছে করে খুলতে শুনলাম, আর শব্দ একই: বোঝা যায়, ছোট থিয়েটারের কাছে এতে কিছু আসে যায় না।

আমরা, পেছনে। আমাদের হাতে দু মিনিট ছিল একটা নাটক বানানোর। নোয়া ভূমিকা ভাগ করল। আগে জিজ্ঞেস করল:

“কে কম কথা বলতে চায়?”

আমি হাত তুললাম। গোটা প্রতিযোগিতার সবচেয়ে দ্রুত হাত।

টুকরো ভেরার কোল থেকে ছুটে গেল, এক মিটার উড়ল আর একটা প্যানেলের ওপর বসল, খুব শক্ত, লেজ ঝুলছে ঠিক জানালার সামনে। সেই সপ্তাহে ওই ফ্রেমে দেখা গিয়েছিল মুখ ভর্তি তোনিওকে, রাস্তার মাঝখানে নোয়াকে আর ছকের সামনে ঘুমন্ত দন আন্তনিওকে। এবার, টুকরোর লেজ। ফ্রেমের একটা অব্যর্থ চোখ আছে, যা দেখার কথা নয় তার জন্য। নাটক তখনও শুরু হয়নি।

ভেরা ওকে তুলে নিলেন হাত বাড়িয়ে, আর টুকরো নিজেকে ধরতে দিল, সেই “আমি করিনি” মুখ নিয়ে, যেটা আমার কাছ থেকে প্রথম দিনেই নকল করেছে।



নাটকের নাম ছিল “যে পার্সেল চুকতে চাইত না”। হুলিতা মারা সাজল, মাথায় কাগজের কোনা-টুপি। নোয়া সাজল সব দরজা, আর শুধু পা বদলে প্রত্যেকটা আলাদা দেখাল। আমি সাজলাম পার্সেল, জানালা দিয়ে উঁকি মেরে।

“ওয়ার্কশপ?” নোয়া বলছিল। “এখানে, সেলাই।”

“ফেরত,” আমি বলছিলাম।

“ওয়ার্কশপ? এখানে, কোরাস।”

“ফেরত।”

আমি নয়বার বললাম। দর্শকরা গুনছিল, আর কোরাস, যারা এজন্যই এসেছিল, সুর মিলিয়ে গুনছিল। দশমবার, নোয়া দুহাত ছড়াল, আর আমি অন্য শব্দটা বললাম।

নমস্কার জানাতে আমরা তিনজন জানালায় উঁকি দিলাম। আমরা এঁটে গেলাম। চাপাচাপি করে। আমার বাঁ কান হুলিতার, আর ডানটা নোয়ার খোঁপার। নিচে, মারা, আসল টুপি-পরা, দুই আঙুলে হাততালি দিচ্ছিলেন।



ভাগ করা যায় না। গা ঘেঁষে বসতে হয়। -হু.



অধ্যায় ৬

প্রতিযোগিতা শেষ হলে কী থাকে?

বিকেলে আমরা লেবেলটা নিয়ে দোকানে ফিরলাম। নোয়াও এল। ও দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল, নোটবই গলায় ঝোলানো, তাকের পার্সেলগুলো আঙুল আর ঠোঁট দিয়ে গুনছিল, আওয়াজ ছাড়া।

হুলিতা দেয়ালের লেখাটা দেখল। তারপর মারার দিকে তাকাল।

“পারি?”

“এটা তোমার লেখা।”

ও নীল টুলে উঠল, ১৫ কেটে বড় করে লিখল ১৪। মারা লেবেলটা ওঁর বইয়ে সেঁটে দিলেন, বাকি পাঁচটার সঙ্গে, আর ওপর দিয়ে দুবার হাত বোলালেন, যেভাবে চাদর সমান করা হয়।

দরজায়, নোয়ার গোনা শেষ হলো।

“চোদ্দ,” ও বলল, কাউকে না।

“চোদ্দ,” হুলিতা টুল থেকে বলল, মার্কারের ঢাকনা তখনও খোলা।

তোনিও ফলাফলের তালিকা আনল, কমিউনিটি সেন্টারের সিল দেওয়া, আমি যাতে খাতায় টুকে নিই: বিজলি, চোদ্দ মিনিট; কিস্তি, উনত্রিশ; সূঁচেরা, তেত্রিশ; কোরাস, আটত্রিশ, একটা অংশ আবার করে; নোয়া + ২, একচল্লিশ। আমি দুবার

দেখলাম। “ব্রুনো” পুরোটা ছিল, না-কাটা আর ওপরে কিছু না। আমাদের দলের ব্যাপারটা ঠিক করে দিল নোয়া ওর ফিরোজা পেনসিল দিয়ে, কেউ না বলতেই: “+ ২” কেটে ওপরে লিখল নোয়া, হুলিতা আর গুনি।

“সোমবার আমি জানতাম না তোমাদের কী ডাকে,” ও বলল। “মানে। গুনিকে কী ডাকে।”

আমি র.-এর কার্ডটা বের করলাম। তাতে এগারোটা সূত্র ছিল। আমি একটা যোগ করলাম: “১২. পাঠানোর আগে ছোট থিয়েটারটা কমিউনিটি সেন্টারের উঠোনে পরীক্ষা করেছিলেন। ইনভেন্টরিতে আছে।” তোনিও ওটা পড়ল। ওর নিজেরটাও পড়ল, নিচে, মুলতুবি: আমাকে একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে, আর কালিতে না ছুঁয়ে আঙুলটা তার নিচ দিয়ে টানল। কিছু কাটল না।

“উনি ছোট থিয়েটারটা পরীক্ষা করেছিলেন,” ও বলল। “আমার ঘণ্টিটা না।”

“সেটা আমরা জানি না,” হুলিতা বলল।

“আমার ঘণ্টির কোনো লাইন কোনো ইনভেন্টরিতে নেই,” তোনিও বলল। আর সেটাও সত্যি ছিল।



তারপর আমি কাউন্টারে নকশাটা খুললাম। মানে: ভাঁজ করা আর ছিল না। বৃহস্পতিবার থেকে ওটা খাতার ভেতরে খোলা অবস্থায় ঘুরছিল, ওপরে উঁকি দিয়ে, কিন্তু ভাঁজের দাগগুলো ছিল, ক্রস-আকারে, জানালার মতো, আর ওগুলো যায় না। একটা নকশা মনে রাখে ওকে কীভাবে রাখা হয়েছে।

আমি এক কোণে মাপার ফিতে আর অন্য কোণে পেনসিলের কৌটো দিয়ে ওটা আটকে রাখলাম।

“তোমার অংশটা নেই,” আমি নোয়াকে বললাম। “ফোয়ারা থেকে ওদিকে যা আছে। ওসব রাস্তার আমি শুধু মিটার জানি।”

কথাটা আমি মহড়া দিইনি। ভেবেছিলাম, যেটা আলাদা: নাটকের সময়, জানালায় উঁকি দিয়ে, ষষ্ঠ ফেরত আর সপ্তমের মাঝে।

নোয়া হুলিতার দিকে তাকাল। হুলিতা ছাদের দিকে তাকাল, যেটা ওর ঝামেলায় না জড়ানোর উপায়, আর ও এমন আগ্রহ নিয়ে তাকাল, যা দোকানের ছাদ কখনও অর্জন করেনি।

"আমি কি ওতে আঁকতে পারি?"

"এজন্যই তো তোমাকে দেখাচ্ছি।"

আমি নকশাটা দুহাতে ওর দিকে ঠেলে দিলাম। নোয়া কানের পেছন থেকে পেনসিলটা বের করে এক মুহূর্ত ওপরে ধরে রাখল, কাগজ না ছুঁয়ে, যেভাবে হাত থেমে থাকে নিজের নয় এমন দরজায় কড়া নাড়ার আগে। তারপর নামাল।

ওই কাগজে অন্য কারও পেনসিল ছোঁয়ার এটা প্রথমবার। ফিরোজা ডগা যতবার নামছিল, আমি ফিতেটা ওর কোণে আরেকটু চেপে ধরছিলাম, যদিও নকশাটার কোথাও যাওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না। হুলিতা খেয়াল করল আর কিছু বলল না, যেটা হুলিতার ক্ষেত্রে খেয়াল করার একটা খুব হইচইওয়ালা উপায়।

ও যোগ করল ওর রাস্তা, ভেতরের সেন্টার, ঘর, উঠোন আর যে করিডর ওগুলো জোড়ে, আর দূরত্ব, পা দিয়ে। ও ছোট আর সোজা করে লেখে, যেন প্রতিটা অক্ষর একটা টাইলে এঁটে যেতে হবে। আমি পাশে মিটার বসাচ্ছিলাম। "ফোয়ারা থেকে আমার সদর দরজা: ৮০ পা," ও লিখল, আর আমি পাশে: "৪৬ মি"। আশি গুণ আটান্ন হলো ছেচল্লিশ মিটার চল্লিশ। ভদ্রতা করে আমি নিচের দিকে গোল করলাম। আমার নকশায় প্রথমবার দুটো একক ছিল, আর কোনোটাই ভুল ছিল না। উঠোনে, নোয়া একটা ছোট ফিরোজা ক্রস দিল: "নোয়ার জায়গা: এখানে পা গোনে"।

হুলিতা আর পারল না। মার্কারের ঢাকনা খুলে ফোয়ারার পাশে, সবুজে, অনুমতি না চেয়ে লিখল: "খোঁড়া মাছ: বাঁ পাখনা নেই। এখানে বাঁয়ে বাঁক"। দোকানে আমরা দুটো ছোট ক্রস দিলাম, একটা পেনসিলে আর একটা সবুজ, এত কাছাকাছি যে ছুঁয়ে ছিল।

ওপরে, নকশার নাম ছিল গুনির নকশা। তার নিচে আমি নতুন নামটা লিখলাম: পাড়ার নকশা (তিনজনের)। বন্ধনীটা আমার আইডিয়া। বন্ধনী আমি সবচেয়ে ভালো পারি।

পাড়ার নকশা (তিনজনের)

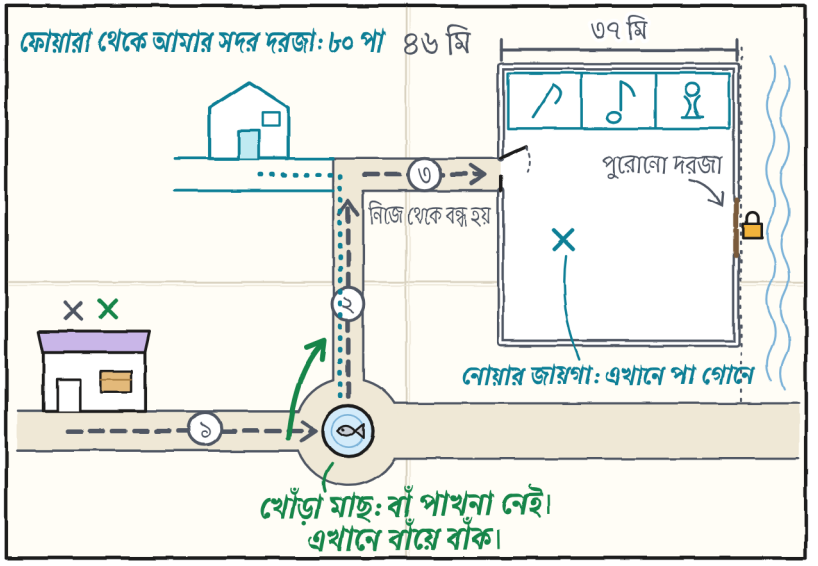

আর ওরা যখন আঁকছিল, আমাকে খোঁড়া মাছের গল্প বলল। দুজনেই একসঙ্গে বলল, কাউন্টারের দুই ধারে, আর আমি একজনের থেকে আরেকজনের দিকে মাথা ঘোরাচ্ছিলাম, যেভাবে নেটের পাশ থেকে ম্যাচ দেখে মানুষ। গল্পটা লম্বা। লোকে যতটা বলে, ততটা ভালো না। কিন্তু এখন আমি ওটা জানি।

দারুণ গল্প। আমরা খারাপ করে বলেছি: একজন আরেকজনের কথার ওপর চড়ে গেছি। -হু.

হুলিতার কবজিতে ফিতেটা বাঁধা ছিল দুপুর থেকে। ইতিমধ্যে তিনটে সুতো খুলে গিয়েছিল। আমি গুনেছি, কারণ ও-ও গুনছিল, নিচু গলায়, যতবার একটা ওভারঅলের পকেটে আটকে যাচ্ছিল।

“আমার কাছে রাখলে, সোমবারে ওটা ঝালর,” ও বলল। “খাতায় রাখব?”

আমরা ওটা প্রথম পাতায় সাঁটলাম, “যৌথ”-এর নিচে আর অর্ধেক পাতা জোড়া সবুজ লেখার নিচে, প্রতি প্রান্তে এক টুকরো আঠালো টেপ দিয়ে। নোয়া এক প্রান্ত ধরল, হুলিতা অন্যটা, আর আমি টুকরো দুটো সোজা করে বসালাম। গিঁটটা ওপরে থাকল, একটু ফোলা; ঝিলিক জায়গা বদলাচ্ছিল যতবার পাশের পাতা কেউ উল্টোচ্ছিল। এক কোণে আমরা তিনটে ছোট আদ্যক্ষর দিলাম: গ, পেনসিলে; হু, সবুজে; ন, ফিরোজায়।

আমি খাতা বন্ধ করে দেখলাম। বন্ধ হচ্ছিল খারাপভাবে: গিঁটটা উঁচু হয়ে ছিল আর মলাট এক কোণে একটু উঠে থাকছিল, যেন কেউ যেতে গিয়েও যেতে পারছে না। আমি মার্জিনে “খুঁত” লিখলাম, তারপর মুছে দিলাম।

আমি ওটা আঁকলাম ওর খোলা সুতোসহ। খুলে গেলে, খুলে যাবে: আমি ওটাকে যতটা আছে তার চেয়ে নতুন আঁকব না।

কাচের ওপাশ থেকে, পাঁচিলের ম্যাগপাই ল্যাম্পপোস্টের ওপর থেকে আমাদের দেখছিল। ও ফিতেটা দেখছিল, আমাদের না। আমি টের পেলাম, কারণ আমি ওর জায়গায় হলে একই জিনিস দেখতাম।



আমার খাতা তোমারটার মতো ভালো বন্ধ হয় না। সেজন্যই। -হু.



নোয়া পাতা উল্টে পেছনে গেল। আগে অনুমতি চাইল, খাতার ওপর হাত খোলা, না ছুঁয়ে, আর আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। ও আস্তে আস্তে উল্টোল, একটা একটা করে, একটাও বাদ না দিয়ে: মঙ্গলবারের মিটার, বুধবারের সবুজ সারি, শেষ পাতা ওর পাঁচিলের টুকরো আর আধখানা তালা নিয়ে, বৃহস্পতিবারের নতুন ঘর। তারপর পৌঁছাল দাগের কোণে।

"আর এটা?"

ওর হাত ছিল ঠিক ততটা দূরত্বে, যতটায় ঢাকা যায়। আমি সরালাম না।

"একটা হিসেব, যেটা আমি ভুল রাখছিলাম।"

"আর এই অন্যটা?" ও জোরে পড়ল: "'ফটক একটা পাথরও ধরে রাখতে পারে'।"

"এটা আমি মঙ্গলবার ভেবেছিলাম।"

হুলিতা টুলের গায়ে পা দোলানো থামাল। তোনিও, ওর বাক্স থেকে, ঘড়ি থেকে চোখ তুলল, যেটা কিছুই মাপছিল না।

"একটা পাথর 'ফুটপাতের ধাপ' বলে না," নোয়া বলল। "'থামো'-ও পনেরোবার না।"

ও বলল ওর মতো করে, গুনে গুনে। তারপর পাতা এগিয়ে নিয়ে গেল, আবার ফিতের দিকে, যেভাবে কেউ বই যেখানে পেয়েছিল সেখানে রেখে দেয়।

আমি দাগগুলো মুছলাম না। পেনসিলে মোছা যায়, কিন্তু চাইনি। বাক্যটার নিচে আমি একটা ছোট পাথর আঁকলাম, একটা কথার বুদবুদসহ। ওটা ফাঁকা রাখলাম।

মুছো না। ওগুলো কিছুটা আমার। -হু.

রবিবার, ভোরে, নোয়া পাহারা দিল, যে সেন্টারের উল্টো দিকে থাকে। নটার সময় ও দোকানে একটা চিরকুট আনল। পা গুনতে গুনতে এসেছিল; ঠোঁট দেখে বোঝা যাচ্ছিল। ওটা তিন সমান ভাগে ভাঁজ করা ছিল; আমি মিলিয়ে দেখলাম। তাতে লেখা ছিল, ফিরোজায়, ছোট আর সোজা অক্ষরে:

- ৭:৩৮: ছোট থিয়েটার, ওয়ার্কশপে, ভাঁজ করা।
- ৭:৪৪: ভোর হচ্ছে। নড়ছে না।
- ৭:৫০: এখনও আছে। ও যত পা ফেলেছে: শূন্য। —নোয়া

ও পাহারা দেয় আমার চেয়ে ভালো, গোনে আমার চেয়ে ভালো, আর রুটি বানায় না। তিনের মধ্যে দুই। -হু.

মারা ঝাঁপটা একটু তুললেন আমাদের ঢুকতে দিতে, আর আমি তাকটা আঁকলাম: চোদ্দটা পার্সেল আর ছয়টা ফাঁকা জায়গা, পরপর, ১ থেকে ৬, যেন দুধদাঁত, যা ক্রমানুসারে পড়ে। দেয়ালের লেখায় হাত দিতে হয়নি।

"ছয়," মারা বললেন। আর ওঁর বই বন্ধ করলেন।

তোনিও ওর বাক্সে ছিল, হেলমেট মাথায়, যদিও রবিবার। নোয়া দাঁড়িয়ে থাকল, দরজার পাশে। কেউ ওকে বসতে বলল না, চলে যেতেও না। ও এসেছে নিজের ইচ্ছেয়, আর সোমবার ওর মহড়া আছে।



খাতা শেষ করতে আমি ছোট থিয়েটারের জানালাটা আঁকলাম, ফাঁকা।

আমি স্কেল দিয়ে আঁকলাম: ফ্রেম, ছোট পর্দা এক পাশে গোটানো, কাঠ তার রেখাসহ। ভেতরে, কিছু না। সপ্তাহের প্রথম জানালা, যেটা দিয়ে কেউ কাকতালীয়ভাবে যাচ্ছিল না, আর আমার মনে হলো এক মুহূর্ত ওটা এভাবে রাখাই ঠিক, যেভাবে দরজা খুলে রাখে মানুষ সিঁড়িতে কারও পায়ের শব্দ শুনলে।

আমি নিজেকে এঁকে নিলাম প্রথমে, পেনসিলে, এক পাশে, যেখানে ছবিতে আমি দাঁড়াই। নিজেকে আঁকা সবচেয়ে কঠিন কাজ: বাইরে থেকে মাপা যায় না। আমি গম্ভীর আর ভালো করে আঁচড়ানো চুল নিয়ে হলাম, যেভাবে আমি রাখি না, যেভাবে রাখতে চাই। শুধরালাম না। বাড়তি জায়গা ছেড়ে রাখলাম।

তারপর আমি খাতাটা কাউন্টারে খোলা রাখলাম, ওদের দিকে মুখ করে, ওপরে পেনসিলটা আড়াআড়ি। কীসের জন্য, বললাম না। মারা, পেছনে, তাকালেন না: কালির শিশিগুলো সাজাতে লেগে গেলেন এমন মনোযোগ দিয়ে, যা ওদের লাগত না।

নোয়া আমার খাতায় আঁকার আগে অনুমতি চাইল। হুলিতা, না।

হুলিতা নিজেকে আঁকল সবুজে, মুখ খোলা আর অন্য দুজনের চেয়ে বড়, কারণ, ও বলল, আসল জীবনেও ও বেশি জায়গা নেয়। নোয়া দুই আঙুল দিয়ে বাকি জায়গাটা মাপল, যেভাবে ও ছোট জিনিস মাপে, আর নিজেকে এঁকে নিল ভেতরে, ফিরোজায়। ওর খোঁপা ফ্রেম ছাড়িয়ে ওপরে বেরিয়ে গেল। শুধরাল না। নোয়ার জন্য ফ্রেম ওপরে ছোট পড়ে, আর ও তা জানে।

আমরা আসল জানালায় এঁটে গিয়েছিলাম, শনিবার, চাপাচাপি করে। কাগজের জানালায়, যেটা আমি বাড়তি জায়গা রেখে এঁকেছিলাম, আমরা ঠিক ততটাই চাপাচাপি করলাম। বাড়তি জায়গাটা কেউ ব্যবহার করল না।

নিচে, পেনসিলে, আমি একটা শব্দ লিখলাম:

এঁটে যাই।

যৌথ মানে যৌথ। প্রথম পাতায় লেখা আছে। -হু.

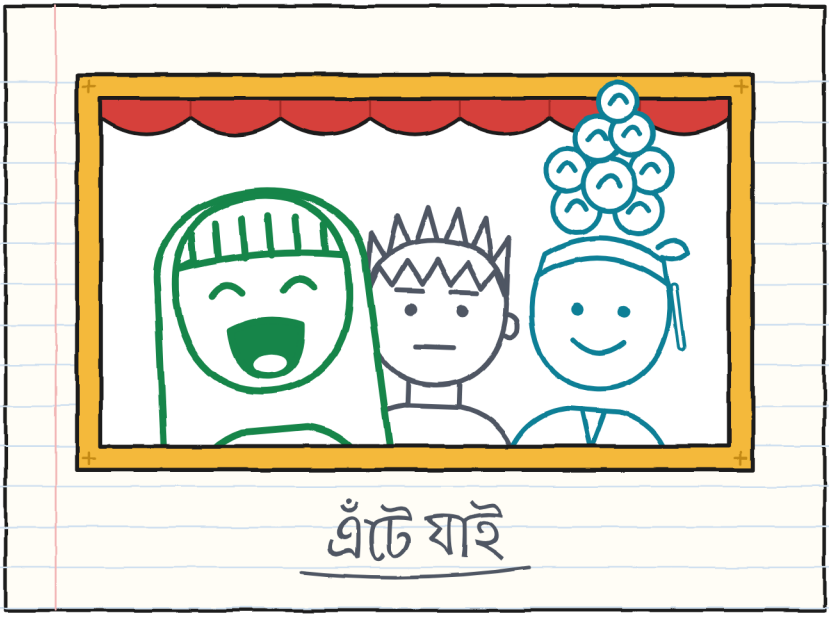

টেবিলটা বাকি ছিল, যেটা আমার সব খাতা শেষ করে। এবার আমি ওটা বানালাম অংশ ধরে ধরে, যেভাবে পুরো সপ্তাহ মাপা হয়েছে।

ডেলিভারি নং ৬। অংশ ধরে ধরে (কে বইত · কে দিক দেখাত · কী আবার করতে হলো):

- দোকান → খোঁড়া মাছের ফোয়ারা: গুনি আর নোয়া · হুলিতা · ফোয়ারার বাঁক (তিনবার)।
- ফোয়ারা → মোড়: হুলিতা আর নোয়া · গুনি · কিছু না (কিন্তু ধীরে)।
- মোড় → উঠোন: গুনি আর হুলিতা · নোয়া · প্রবেশ: ম্যাপটা পুরোনো ছিল।
- শনিবার: তিনজন · তিনজন, পালা করে · বেল্ট (দ্বিতীয়বারে, তৃতীয় ফুটোয়)।
- আমাদের আগে: মারা, একা · কেউ না · নয়টা যাত্রা।
- র.: ? · ? · আমরা জানি না।

নিচে আমি তিনজনের মিটার আঁকলাম, চারটে ঘর ভরা আর তিনটে নাম জায়গা বদলে।

তিনটে ঘর। আচ্ছা, চারটে। তিনটে নাম। একটাও ফাঁকা নয়। -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি · ৭

(খুব শিগগির)



এবার লেবেলে এমন একটা সময় চাওয়া হয়েছে, যখন আমি আগেই পাজামা পরে ফেলি।

অন্য সবাই বন্ধ করে দিলে কে জেগে থাকে? আমি ছাড়া। -হু.

পাড়া (সংস্করণ ৬)

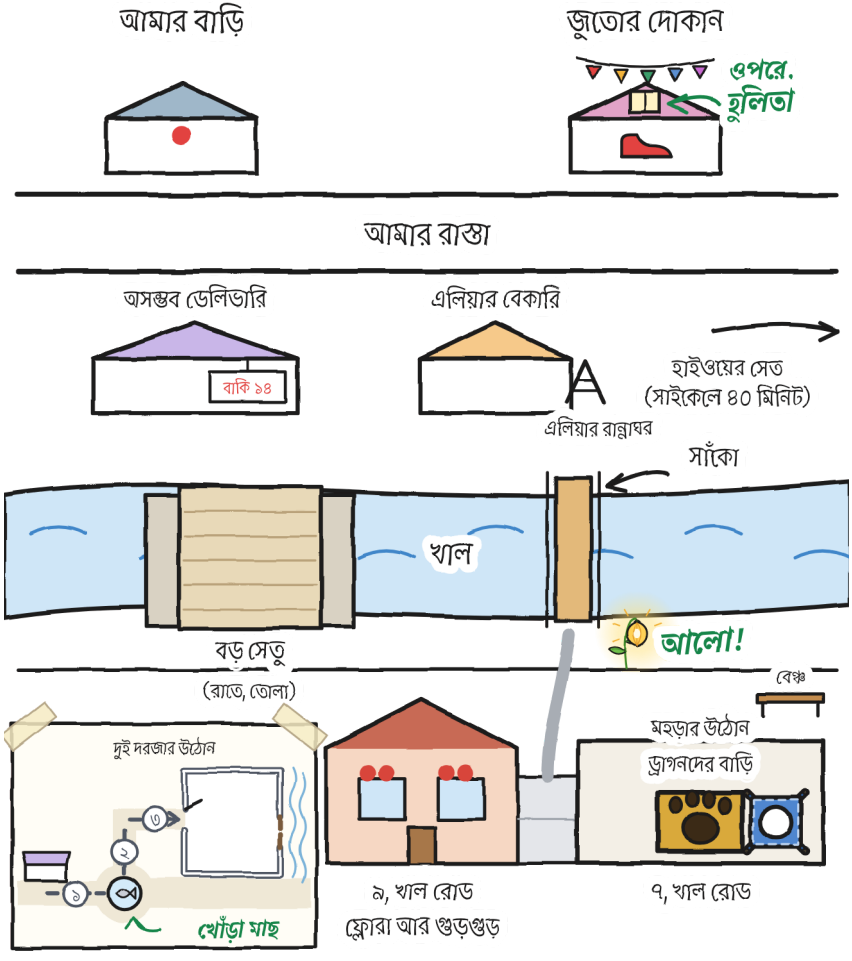
আমার বাড়ি
জুতোর দোকান
ওপরে, হুলিতা
আমার রাস্তা
অসম্ভব ডেলিভারি
বাকি ১৪
এলিয়ার বেকারি
এলিয়ার রান্নাঘর
হাইওয়ের সেত
(সাইকেলে ৪০ মিনিট)
সাঁকো
খাল
আলো!
বড় সেতু
(রাতে, তোলা)
বেঞ্চ
মহড়ার উঠোন
ড্রাগনদের বাড়ি
দুই দরজার উঠোন
খোঁড়া মাছ
৯, খাল রোড
ফ্লোরা আর গুড়গুড়
৭, খাল রোড

তোমার যাত্রা

কে বয়? কে দিক দেখায়? কে পথ করে দেয়? কে জানায়?

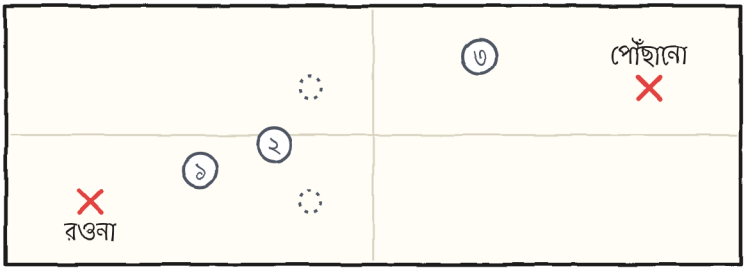

তিনজনের মিটার

	বওয়া	দিক দেখানো	পথ করে দেওয়া	জানানো
অংশ ১				
অংশ ২				
অংশ ৩				

কোনো ঘরে যদি বারবার একই নাম আসে, বদলাও। -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি

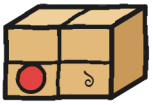

১ · এই পার্সেলটা কামড়ায়

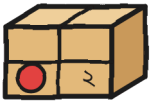

২ · মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

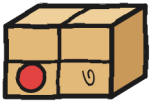

৩ · ফেরত, দয়া করে

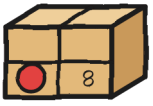

৪ · এখানে নয়, টুকরো!

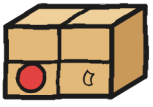

৫ · একটা কেক দুজনের

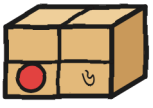

৬ · একটা জায়গা তিনজনের

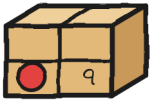

৭ · (খুব শিগগির)

চোদ্দটা বাকি। -হু.

একটা গল্প, ছয় সাইজ

এই বইটা ছয়টা সাইজে আছে, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ২০টিরও বেশি ভাষায়। XXS, XS, S, M আর L একই ছবি নিয়ে পাতায় পাতায় গল্পটা বলে, প্রতিবার আরও একটু সূক্ষ্মতা নিয়ে; XL হলো উপন্যাস: একই গল্প, যেখানে গুনি যা ভাবে অথচ বলে না, তার সবকিছুর জন্য জায়গা আছে।

CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক: XXS, pre-A1 · XS, A1 · S, A2 · M, B1 · L, B2 · XL, B2–C1।

যে যার সাইজে। একই ছোট থিয়েটার। -হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো (L সাইজের অ্যাক্টিভিটিসহ)

সত্যিকারের স্থানান্তর: কী করতে হবে

১. যাওয়ার আগে পুরো পথটা দেখে নাও।

২. একজন খালি হাতে যায়: দরজা খোলে আর জানিয়ে দেয়।

৩. হাত থাকবে হাতলে। কবজা আর আটকানোর জায়গা থেকে দূরে।

৪. বোঝা নিয়ে ছোটা বা প্রতিযোগিতা করা চলে না।

৫. কেউ "থামো" বললে সবাই থামে।

৬. আগে মাটিতে নামাও; তারপর তর্ক।

৭. বড় জিনিস খোলা আর ভাঁজ করা হয় দুজনে মিলে, একজন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে।

"শুধু গল্পে" সিলমোহর বোঝায় যা গল্পে ঘটতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের স্থানান্তরে নয়।

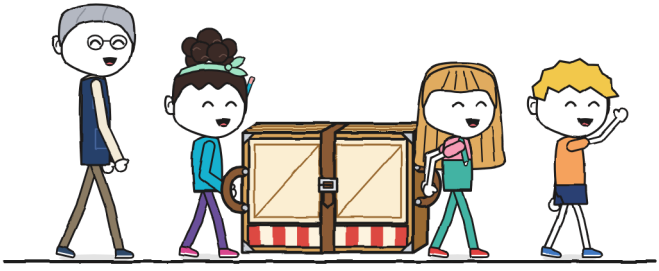

আর পথের কিছু জানা থাকলে আগেই বলে দাও। -হু.